ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে



In the Canteen of the University

মাহমুদুল হাসান।

জন্ম ২৩ জুন ১৯৮২। গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত শাহরাস্তি থানার দেবকরা গ্রামে। পিতা মো. আবুল হোসেন ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক: সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। যেখানেই গেছেন লেফট-রাইট আর দড়াম আওয়াজের স্যালুট তার পিছু পিছু ছুটেছে। পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের ইচ্ছে ছিল তাকে সেনা অফিসার বানানোর। কিন্তু নাতিকে হাফেয বানানোর অসিয়ত ছিল মরহুম দাদা ওসমান গণির। মা ফেরদৌস বেগমের আশাও ছিল তাই। সুতরাং রাইফেল-উর্দির স্বপ্নকে চিরতরে বিদায় দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল হিফজখানায়। ভর্তি হতে হয়েছিল ঢাকা জেলার শেষ প্রান্তে সাভারের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা- জামেয়া মাদানিয়া রাজফুলবাড়িয়ায়। হিফজ শেষ করে কিতাব বিভাগের প্রথম ক্লাশে পড়া অবস্থায় দীর্ঘ এক বন্ধ কেটেছিল দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে। সে বাড়ির বুক সেলফ থেকে প্রথমে নানা রকম বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল তার। চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিয়েছিল বুক সেলফের সেই বইগুলো। পরে নজরুল ইসলাম পথিক নামের নিভৃতচারী এক সাহিত্যিক সুহৃদের মাধ্যমে লেখালেখির হাতেখড়ি ও প্রাথমিক কসরতটা হয়েছিল।

উপরি উক্ত মাদরাসা থেকেই তিনি ২০০৫ সালে দাওরায়ে হাদিস পাস করেছেন। শিক্ষকতাও করেছেন সেই মাদরাসায়। এখনো নিয়োজিত আছেন একই পেশায়।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হুসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

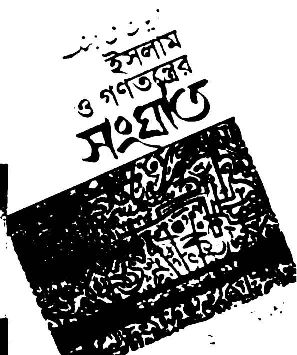
আমাদের প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহের কয়েকটি





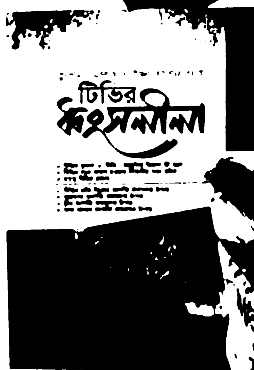
মাওলানা মাহমুদুল হাসান

মূল্য : ২০০ টাকা



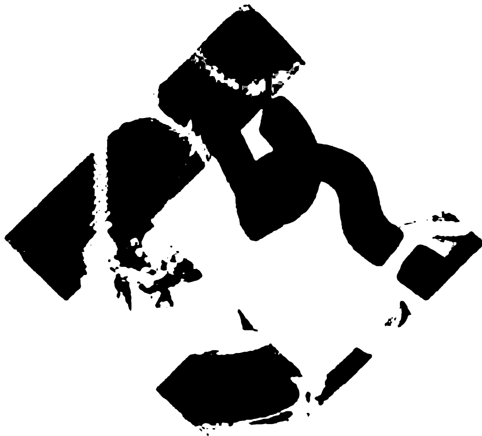








ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে



মূল

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব



ভাষান্তর

মাওলানা মাহমুদুল হাসান
শিক্ষক, মাহাদুর রাবেয়া দারুল উলুম গোয়ালদী
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে

মূল
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাবান্তর
মাওলানা মাহমুদুল হাসান

প্রকাশনা
১৫ (পনের)

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩৬৫৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

২৫০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচিপত্র







আমাদের স্বপ্ন

আল-হামদু লিল্লাহ। মাঝে মাঝে পাঠকরা আমাদেরকে ফোন করছেন। ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তাদের অভিব্যক্তি তুলে ধরছেন। সে দিন একজন জানালেন, হুদহুদের বই অন্যকে গিফ্‌ট করার মত। আরেক জন জানিয়েছেন, হুদহুদের বই পড়ে তিনি নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করছেন। কেউ কেউ হুদহুদের সমস্ত বই কেনার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।...

আমরা মনে করি, আপনি হুদহুদ পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি হুদহুদের বই পড়েছেন। হোক দু-চার হরফ। এ কথার মানে হচ্ছে জীবনের মূল্যবান সময় থেকে আপনি আমাদেরকে খানিকটা অংশ দিয়েছেন। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। জীবন পরিশীলনে আমরা আপনার আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাই। আপনি কি অনুগ্রহ করবেন?

বাংলা ইসলামী সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ– সাহিত্যের মান দুর্বল; তথ্য-উপাত্তের শতভাগ বিশুদ্ধতা অনিশ্চিত; কাগজ-মুদ্রণ বাজে; বাঁধাই নড়বড়ে। আরও বড় কথা, অনুবাদ আর অনুকরণের ছড়াছড়ি। এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন–

- সাহিত্যমান ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য একটি সেন্সর বোর্ড গঠন করেছি।
- সূচনা থেকেই উন্নত কাগজ-কালি ব্যবহার করে উন্নত প্রেসে বই-পুস্তক ছাপছি।



- সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভালো বাইন্ডার দিয়ে বই-পুস্তক বাঁধাই করছি।
- শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের প্রয়োজন বিবেচনা করে মৌলিক রচনাবলি প্রকাশ করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখছি।
- অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করে স্বীকৃত বিদেশী গ্রন্থাবলি অনুবাদের তালিকাভুক্ত করছি।
- দৃষ্টিনন্দন করার জন্য একাধিক রঙে বই-পুস্তক প্রকাশ করছি।
- পাঠকবন্ধুদের তালিকা দীর্ঘ করার জন্য সর্বোচ্চ কম দামে গ্রন্থাবলি বাজারজাত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, মুসলমানদের আন্তরিক দোআ প্রাপ্তি এবং দুনিয়াতে হালাল মুনাফা অর্জন। মুসলিম সমাজে আমরা বিতরণ করতে চাই উপকারী ইল্‌ম। যেই ইল্‌ম জীবনে উপকারে আসে না, তা থেকে আমাদের মহানবী আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আমরাও সেই ইল্‌ম বিতরণ করতে চাই না।

হুদহুদ পাখি সুলাইমান আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে অমুসলিমের দুয়ারে তাওহীদের বার্তা পৌঁছে দিত। মুসাফির কাফেলাকে দিত মিষ্টি পানির সন্ধান। হুদহুদ প্রকাশনও আল্লাহভোলা লোকদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দিতে চায়। জ্ঞানপিপাসায় কাতর সমাজকে দিতে চায় অমীয় সুধার সন্ধান।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক স্বপ্ন আছে হুদহুদ প্রকাশনের; কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য পাঠকবন্ধুদের বলিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা প্রস্তুত; আপনি প্রস্তুত আছেন?



যদি আপনার প্রাইভেট কারে, সন্তানের পড়ার টেবিলে, আপনার বালিশের পাশে, অফিসের বুকসেলফে, আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবকে প্রদেয় গিফটের তালিকায়, আপনার ভ্রমণের ব্রিফকেসে হুদহুদ প্রকাশনের বই-পুস্তক জায়গা পায়, আর সুযোগ পেলেই যদি তাতে চোখ বোলানো হয়, তা হলে আমরা মনে করব আপনি বন্ধুত্বের তালিকায় হুদহুদকে জায়গা দিয়েছেন। হুদহুদ আপনার আপনজন।

যদি আমাদের কোন বই পড়ে আপনি পুলকিত হন; যদি আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় একটু সাড়া জাগে, তা হলে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে যান, অথবা খুলে ফেলুন আপনার ই-মেইল আইডি। লিখে ফেলুন ছোট্ট একটি মেসেজ। বাংলা, আরবী, ইংরেজি অথবা উর্দুতে। তারপর সেন্ড করুন আমাদের ঠিকানায়। পক্ষান্তরে যদি আমাদের কোন বই পড়ে আপনি রুষ্ট হন, আপনার চোখে ধরা পড়ে আমাদের কোন ত্রুটি, তা হলেও আপনার পরামর্শ লিখে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা খুশি হব; আপনার জন্য দোআ করব এবং শুধরে যাব।

আমরা আপনার সাথে এমন বন্ধুত্ব কায়েম করতে চাই, যার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি। যার প্রতিদান বিচারের দিনে আরশের নীচে ছায়া প্রাপ্তি। হাদীস শরীফে আছে– যদি দু'জন লোক একে অপরকে ভালোবাসে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; এই লক্ষেই তারা (মাঝে মাঝে) মিলিত হয় এবং এই লক্ষেই বিচ্ছিন্ন হয়, তা হলে তারা সেই দিন আরশের ছায়ায় জায়গা পাবে, যে দিন উক্ত ছায়া বাদে আর কোন ছায়া থাকবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

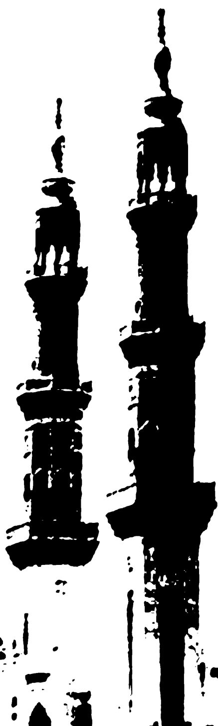
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক
হুদহুদ প্রকাশন



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কানয দ্বীপে

মেয়েটির নাম সারা। এলাকার আর দশটা মেয়ের চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয় সে। সুন্দর মুখশ্রী। মধ্যম গড়ন। বুদ্ধিদীপ্ত চলন। শৈশব থেকেই ওর চিন্তা-চেতনা ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সারা'র মাও চাইতেন তার মেয়ে হবে সবার থেকে ব্যতিক্রম। মেয়েকে অনেক ভালোবাসতেন তিনি। তাই তাকে নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিলো না তার।



কানয দ্বীপ ও পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার মাঝে খুব একটা তফাত ছিল না। পথে বেরুলেই চারিদিকে উঁচু মিনারের সুদৃশ্য মসজিদ আর নূরানী চেহারার মুসলমান চোখে পড়ত; যা পথের শোভা বহুগুনে বাড়িয়ে দিতো। পুরুষদের মন আত্মমর্যাদা ও পৌরুষত্বের মহিমায় ভরপুর ছিল। রাস্তায় কিংবা বাসে কোনো নারীর সাথে অশালীন আচরণ করার মতো দুঃসাহস ছিল না কারোই। নারীরাও নিজেদেরকে লজ্জার আবরণে সদা আবৃত রাখত।





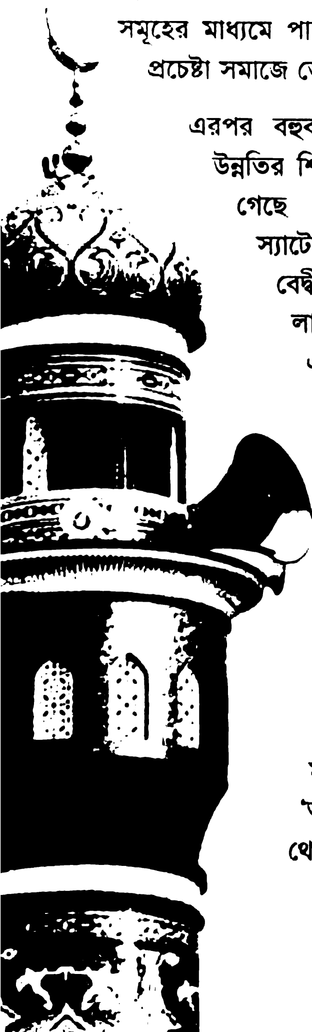
অধিকাংশ নারী শরঈ পর্দা পালনে ব্রতী ছিল। আর এভাবেই তারা নিজেদেরকে পুরুষের কামুক দৃষ্টি ও উপহাসমূলক বাক্যবান থেকে নিরাপদ রাখত।

দ্বীপটিতে একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। ছোট বড় সবাই তাকে সশ্রদ্ধ মুহাব্বত করত। বাদশাহ, আমির-উমারা, মন্ত্রী-আমলা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সবার পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। জনসাধারণের কাছে তার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি যা বলতেন নির্দ্বিধায় সবাই তা মেনে নিতো। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন অতি মর্যাদাবান আল্লাহভীরু আলেম। মহান প্রভূর সান্নিধ্য অর্জনের নিমগ্নতায় কেটে যেত তার রাত-দিন।

কানয দ্বীপের টেলিভিশনগুলোতেও উন্মত্ত নৃত্ত-গীতির পসরা ছিল না। ছিল না কোনো নারীর উপস্থিতি। কানয দ্বীপে জীবন ছিল বড় সুন্দর ও শান্তিময়। মানুষেরা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদে জড়াত না। আলেম সাহেব কোনো বিষয়ে ফতোয়া দিলে লোকেরা তা অকপটে মেনে নিতো। জুমার দিন খতিব সাহেব প্রদত্ত খুতবা ও আল্লাহর পথে আহবানকারীর সুমিষ্ট বাণী তারা মনোযোগ সহকারে শুনত এবং আমলে পরিণত করত। দ্বীপের লোকদের ওপর বিজাতীয় সংস্কৃতি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

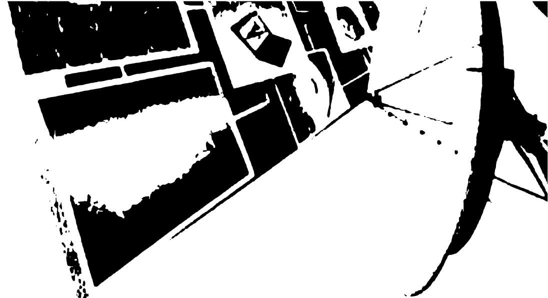


তবে মাঝে মাঝে বিজাতীয় কৃষ্টির পক্ষে কিছু ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যেত। যাদের মুখ থেকে এ আওয়াজ বেরুতো, তারা বিজাতীয়দের জীবনধারায় আসক্ত ও শত্রু পক্ষের চক্রান্তের শিকার ছিল। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের কতিপয় কর্মচারীও নির্লজ্জতার প্রসার ও অশ্লীল চ্যানেল সমূহের মাধ্যমে পাপের বীজ বপনে তৎপর ছিল। তথাপি তাদের প্রচেষ্টা সমাজে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।



এরপর বহুবছর কেটে গেছে। প্রচার মাধ্যমও পৌঁছেছে উন্নতির শিখরে। কানয দ্বীপের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছে গেছে ডিশ তথা স্যাটেলাইট কানেকশন। আর স্যাটেলাইট কানেকশনের হাত ধরে এখানে বেদ্বীন-কাফেরদের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। দ্বীপের অধিবাসীরা এখন টিভির পর্দায় এমন মানুষদের দেখতে লাগল যাদের জীবনধারা ছিল পশুসুলভ। বরং তাদের যাপিত জীবন ছিল আরো নিম্নতর। খানা-পিনা, ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-ফুর্তি ছাড়া যাদের কাছে জীবনের অন্য কোনো অর্থ ছিল না। ছিল না নামাজ-রোজা কিংবা আত্মিক পবিত্রতা বা দৈহিক পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই।

কানয দ্বীপের মুসলিম নারীগণ টেলিভিশনের পর্দায় উলঙ্গ-বেহায়া নারীদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি দেখতে লাগল। দ্বীপের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মহোদয় চিৎকার করে বলতে লাগলেন- 'আল্লাহকে ভয় করো। বিজাতিদের অনুসরণ থেকে বাঁচো। নিজ দীনের ওপর অবিচল থাকো'।

তিনি নারীদের প্রতি বিশেষভাবে আহবান জানালেন– 'তোমরা হিজাব খুলো না। পর্দা ছেড়ো না। তোমরা হলে মূল্যবান রত্ন। যে কেউ তোমাদেরকে দেখার বৈধতা নেই। তোমরা সতী-সাধ্ববী। তোমরা আমাদের মা, আমদের বোন, আমাদের কন্যা। আমাদের ইজ্জত তোমরা'।

তিনি তাদের হাতে পায়ে ধরে ধ্বংসের গহব্বর থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে চাইলেন। দ্বীপের অন্যান্য আলেমগণও রেডিও, টিভিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহয়তায়, জুমআর খুতবার আলোচনায়, লেখালেখির সক্রিয়তায় নানাভাবে এর কুফল তুলে ধরছিলেন। তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে, নদীর উত্তাল তরঙ্গে ভাসমান নৌকাতে ফুটো হয়ে গেলে তা নিমজ্জন সুনিশ্চিত। লোকেরা আলেমদেরকে ভালোবাসতো বলে তাদের কথা মানতে লাগল।

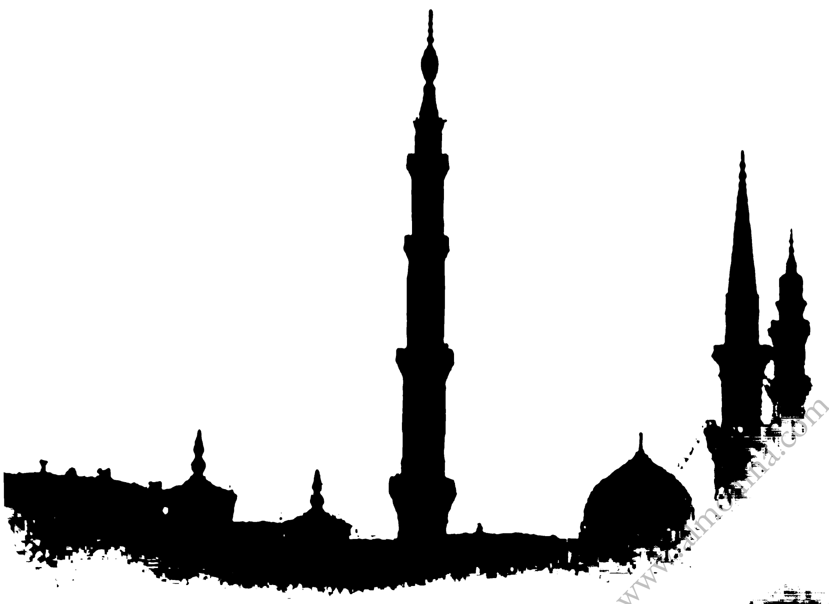
কয়েক বছর পরের কথা। সর্বজন শ্রদ্ধেয় সেই আলেম ব্যক্তিটি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার সমকালিন বাকী আলেমগণও একে একে সবাই প্রভূর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন। জীবিতরা পূর্বসূরীদের মহান দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তারা সেই নৌকাটিকে নিমজ্জনের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট রইলেন।

এদিকে শত্রুপক্ষও বসে নেই। তারা লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলছে- হে দ্বীপবাসী! আমাদের দিকে তাকাও। দেখো কতো আনন্দময় আমাদের জীবন। যুবকের বাহুতে যুবতী নারী। যখন যেখানে খুশি দু'জন দুজনার সান্নিধ্য গ্রহণে কোনো বাঁধা নেই। দেখো, মেয়েরা সমুদ্র তটের মুক্ত বাতাসে বিকিনি পরে জীবনের স্বাদ নিচ্ছে।

নারী-স্বাধীনতার স্বাদ নিতে আকাশের বিশালতায় ছুটে চলা উড়োজাহাজে যাত্রীদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকছে। হোটেল-রিসিপশনে নিজেদের চপলা-চঞ্চলা অঙ্গভঙ্গিতে গ্রাহকদেরকে বিমুগ্ধতায় ডুবিয়ে রাখছে।

কিন্তু কানয দ্বীপের নারীকূল মনোলোভা এ আহবানে সাড়া দিলো না। কারণ, 'কাঁধের গোস্ত কোথা থেকে কেটে খেতে হয়' (অর্থাৎ এ কাজ কিভাবে আঞ্জাম দিতে হয়) নির্বুদ্ধিতা বশত শত্রুপক্ষের তা জানা ছিল না।

সেসব পুণ্যাত্মা নারীগণ যারা আশৈশব শরঈ পর্দার পূর্ণ পাবন্দি করে আসছে, তারা হঠাৎ অনাবৃত মুখে পর পুরুষের সামনে যাওয়া কিংবা এক ঝটকায় নিজেদের হিজাব খুলে ফেলাকে কিভাবে মেনে নেবে? ফলে শত্রুপক্ষের কুবাসনা পূরণে এসব পূণ্যাত্মা নারীগণ কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না।



তীব্র স্রোতকে দিখণ্ডিত করণ

শত্রুপক্ষ নারীদেরকে হিজাব-মুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে ব্যর্থ হতে দেখে বুঝতে পারল যে, তারা তীব্র স্রোতের বিপরীত মুখে চলছে। তাই তারা স্রোতের তীব্রতাকে দিখণ্ডিত করে তাকে দূর্বল করার পন্থা অবলম্বন করল। নারীদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভেঙে ফেলা মুশকিল। কিন্তু কোনোভাবে তাদের ঐক্যের বাঁধন যদি খুলে দেওয়া যায়, তাহলে ভেঙে ফেলা সহজ হবে।

শত্রুপক্ষ ধূর্ত দৃষ্টিতে দেখল যে, নারীগণ নিজেদেরকে আবৃত রাখতে যেসব হিজাব বা বোরকা পরে থাকে সেগুলো যথেষ্ট ঢিলেঢালা ও গোটা শরীরের আদ্যোপান্ত আবৃতকারী। নারীরা বোরকা পরে পথে বেরুলে তাদের শরীরের কোন অঙ্গই আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

তাই এবার তারা নতুন ফন্দি আঁটল। তারা বলতে লাগল– আমরা এ কথা বলছি না যে, তোমরা বোরকা পুরোপুরি খুলে ফেলো। কারণ তা হারাম। কিন্তু দেখো, যে বোরকাগুলো তোমরা গায়ে জড়াচ্ছ সেগুলোর স্টাইল খুবই সেকেলে। আধুনিকতার নামগন্ধও নেই তাতে। বর্তমান যুগের সাথে সেগুলো একেবারেই বেমানান। তোমাদেরকে আধুনিক বোরকা পরতে হবে।



অতঃপর আধুনিক পোষাক ডিজাইনাররা কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। তারা নানা রকম নতুন নতুন ডিজাইনের বোরকা তৈরী করল; যেগুলোর ব্যাপ্তি সাধারণ বোরকার চেয়ে অনেক কম ছিল। তাতে কি? নামসর্বস্ব হলেও সেগুলোতো বোরকাই ছিল। তাই নারীদের অনেকেই সেসব বোরকা পরতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বোরকা 'গাউন'-এর রূপ পরিগ্রহ করল। সৌন্দর্যকে আড়াল করার জন্যে যে বোরকা পরিধান করা হতো এখন তা নিজেই সৌন্দর্য প্রকাশক হয়ে গেল। শত্রুপক্ষ এখন খুশির জোয়ারে ভাসছে। তারা অনুভব করল স্রোতের তীব্রতা ক্রমেই দূর্বল হয়ে আসছে। তারপর নিত্যনতুন ফ্যাশনের হাত ধরে এমন বোরকার প্রচলন শুরু হলো যা বেল্ট দ্বারা কোমরে বেঁধে রাখতে হতো। ক্রমশ এমন বোরকার উদ্ভব ঘটল যা আঁটসাট হয়ে শরীরে লেগে থাকত। যাতে দেহের প্রলুব্ধকর অঙ্গের ভাঁজ প্রস্ফুটিত হয়ে পড়ত। এখন মানুষের ললুপ দৃষ্টি বোরকা পরা নারীদের পিছু ছুটল। আর এভাবেই একটি শান্ত সমাজ ব্যবস্থায় অস্থিরতা শিকড় গেড়ে বসল।



নৌকাটির নিমজ্জন তরান্বিত হতে লাগল। এ দেখে সমাজ সংস্কারক আলেমগণ চুপ করে বসে রইলেন না। তারা সেসব বোরকার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে লাগলেন। বক্তাদের অগ্নিঝরা জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কেঁপে উঠল মিম্বর। ইসলামের দাঈরা ওয়ায-নছীহতের মাধ্যমে এর জঘন্যতা বর্ণনা করতে লাগলেন। তারা সৌন্দর্য প্রকাশক এসব ফ্যাশনেবল বোরকা পরিধানকারী নারীদেরকে এর মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। এবং বললেন, তোমাদের এসব বোরকা দ্বারা সেসব অঙ্গ দৃশ্যমান হয় যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।



সংকুচিত ও চিকন বোরকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি সচেতন মানুষেরই জ্ঞান ছিল। তাই এর প্রচলন কমে আসল। নারীগণ পুনরায় সেসব বোরকা গায়ে জড়াতে লাগল যা গোটা শরীরকে ঢেকে রাখে।

শত্রুপক্ষ তাদের সব পরিশ্রম পণ্ড হতে দেখে প্রচণ্ড হতাশ হলো। পর্দা অপসারণ করে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে তাদের শত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তারা দেখল, দিন-রাত এক করে, প্রতারণার হাজারো ফাঁদ পেতে তারা যখন নারীদেরকে তাদের জালে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে, ঠিক তখনই কোনো আলেম এসে তাদের সামনে পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদিসের বাণী পাঠ করে শোনালে মুহূর্তেই তারা তওবা করে নিজেদের শুধরে নিচ্ছে।

বস্তুতঃ ফেতনাবাজদের একথা জানা ছিল না যে, প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে ইসলামের শিকড় গ্রোথিত রয়েছে অত্যন্ত দৃঢ় ও সুগভীরভাবে। মুসলিম নারীরা মাঝেমাঝে ভুল যেমন করে, তেমনি দ্রুত তওবাও করে নেয় এবং ফিরে আসে ইসলামের দিকে।

মুসলিম নারীদের চরিত্র খাঁটি সোনার মতো। পরিচ্ছন্নতার হালকা প্রলেপ পেলেই ধূলাবালি দূর হয়ে পূর্বের ন্যায় চমকাতে থাকে।

পরিশেষে অনেক চিন্তা-ফিকিরের পর শত্রুপক্ষ প্রতারণার নতুন পন্থা উদ্ভাবন করল।



বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ

ফেতনাবাজরা গভীর মনোযোগে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে লাগল এটি দেখার জন্য যে, অতীতে মুসলিম দেশগুলো থেকে পর্দা প্রথা কিভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল। তারা দেখল, পর্দা প্রথা বিলুপ্তির শুরু লগ্নে নারীদেরকে প্রথমে চেহারা খোলা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। অতঃপর চেহারা খোলা রাখাটা যখন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হলো, তখন চেহারাকে সৌন্দর্য বর্ধনের বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলো। তারপর এলো বোরকার রঙে ভিন্নতা। সাদামাটা কাপড়ের পরিবর্তে উজ্জ্বল-মসৃন, কারুকার্য খচিত কাপড় ব্যবহার হতে লাগল। নারীদের রূপ-মাধুরীও যেন বেড়ে গেল। তারা মুখাবয়বের কমনীয়তা প্রদর্শনে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। এতোদিন কপালকে হিজাবের আওতাভূক্ত রেখেছিল কিন্তু এখন সেটাও উন্মুক্ত করে দিল। ধীরে ধীরে মাথার চুলও দৃশ্যমান হতে লাগল। আর এভাবেই অতীতের নারীরা পর্দা থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

শত্রুপক্ষ কানয দ্বীপের নারীদের মাঝে এই ফর্মুলাটি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলো। কারণ, কানয দ্বীপের নারীরা বোরকা পরিধানকালে পূর্ণ চেহারা ঢেকে রাখত। স্যাটেলাইট চ্যানেল ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রথমে তাদের সামনে তুলে ধরা হলো যে, পর্দার ক্ষেত্রে চেহারা ঢেকে রাখার কোনো আবশ্যিকতা শরিয়তে নেই। নারীদের জন্যে চেহারা খোলা রাখা জায়েয আছে। অনেক ওলামায়ে কেরাম চেহারা উন্মুক্ত রাখার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, চেহারার পর্দার বিষয়টিকে মতবিরোধ-পূর্ণ হিসেবে প্রমাণিত করা। অতঃপর স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে কিছু মুফতিয়ানে কেরাম সরাসরি ফতোয়া দিতে লাগল যে,

ঘরের বাইরে বেরুবার সময় নারীরা চাইলে তাদের মুখাবয়ব খোলা রাখতে পারে। এটা তাদের জন্যে জায়েয আছে। আল্লাহ তাআলা নারীদের যেসব সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, চেহারা সেসবের আওতাভূক্ত নয়।

আমাদের কর্তব্য

সারা বরাবরই শরঈ পর্দা পালনে সচেষ্ট ছিল। একজন খাঁটি মুসলিম নারীর মূর্ত প্রতীক হয়েই সে লোকসমাজে চলাফেরা করত। তার সুউচ্চ ব্যক্তিত্ববোধ ও পাহাড়সম অবিচলতায় যে কেউ প্রভাবিত হতো। রোজ সকালে এলাকার সড়কগুলো যখন মানুষের পদভারে মুখরিত হতো, তখন সারা এমন কিছু নারীদের দেখতে পেত যাদের চেহারা অনাবৃত থাকত। এসব বিষয় সারাকে মোটেই প্রভাবিত করতে পারত না। সে আপন মনে পথ চলত। যেসব ছাত্রীরা হিজাব পরিধানকালে পূর্ণ অবয়ব ও চেহারা ঢেকে রাখত, তাদেরই একজন ছিল সারা। অন্যান্য ছাত্রীদের অবস্থা এরূপ ছিল– কেউ গায়ে বোরকা জড়ালেও চেহারা খোলা রাখত আর কেউ এমন বোরকা পরত যা দেখতে গাউন-এর মতো। ছুটির পর কলেজের সামনে যুবকদের লাইন লেগে যেত। যারা মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত এবং সুযোগ পেলে ইভটিজিং করত। কিন্তু পূর্ণ হিজাব পরিহিত সারা যুবক দলের সামনে দিয়েই হেঁটে চলে আসত অথচ তার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাত না।
কোনো অশ্রাব্য বাক্য তাকে শুনতে হতো না। যেন ফেরেশতাদের অদৃশ্য পহরা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখত।



হাসপাতালে একদিন

সারার আম্মা আমেনা বেগম নয় মাসের অন্তসত্ত্বা। ঘরের প্রতিটি সদস্য নতুন অতিথীর আগমনের দিন গুনছে। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো এবং ঘর আলো করা একটি ফুটফুটে শিশু ভূমিষ্ট হলো। সারা তার বাবার সাথে সন্ধ্যায় হাসপাতালে আসল। আমেনাকে দেখার জন্য সেখানে আরো অনেক মহিলার সমাগম হলো। তাদের মধ্যে এক সুদর্শনা তরুণীও ছিল। সে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বসা ছিল। তার চেহারা থেকে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি টপকাচ্ছিল। মেয়েটি এসেছিল সাদামাটা একটা বোরকা পরে। তবে চেহারা ছিল অনাবৃত। তার রূপের আলোকচ্ছটা যেন ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। আসা-যাওয়ার পথে লোকজন বিমুগ্ধ নয়নে তাকে বারবার দেখছিল।

সারা খুবই অবাক হলো। ভাবল, এ কেমন মেয়েরে বাবা! রূপের দোকান খুলে বসে আছে। অথচ আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলো ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। সারা সাহসী বটে তবে অভদ্র নয়। সে ধীরপদে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। বিনম্র কণ্ঠে সালাম দিল। দু'চার কথা বলার পর জানা গেলো, মেয়েটির নাম উরাইয। তার বড় বোনও সন্তান সম্ভবা। সেজন্যেই হাসপাতালে আসা। প্রাথমিক সৌজন্যতা শেষে সারা বলল, আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল, চলুন না পাশের ওয়েটিং রুমে বসে নীরবে কথা বলি।

কথায় কথায় জানা গেলো নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে উরাইযের ব্যাপক পড়াশোনা রয়েছে। সারার জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও অসমৃদ্ধ নয়। তাই দু'জনার আলাপচারিতা বেশ জমে উঠল।



সারা ও উরাইযের কথোপকথন

সারা বলল, উরাইয তুমি নিশ্চয় জানো যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন– নারী ও পুরুষ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

'এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী।' *(সূরা নজম : আয়াত ৪৫)*

তুমি এটাও নিশ্চয় জানো যে, এ দুয়ের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক কত গভীর। এরা একে অপরের পরিপূরক। জীবনের চাকা সচল রাখতে নারী-পুরুষের যুগল অবদান সুবিদিত। জগত সংসারে মানব-বংশ বৃদ্ধিতে এরা দুজনেই সমান অংশিদার। দীনের সাধারণ বিষয়াবলির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো বিভেদ নেই। দায়িত্ব পালনের বিবেচনায় দুজনেই সমান।



রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের ন্যায় নারীদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। পুরুষদের ন্যায় নারীদের থেকেও বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি তিনি নারীদেরও ইমাম ছিলেন। পুরুষদের মতো নারীদেরকেও দীনের কথা শোনাতেন। নারীরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পুরুষদের ন্যায় নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারত এবং পুরুষদের মতো তাদের পরামর্শও গৃহিত হতো।

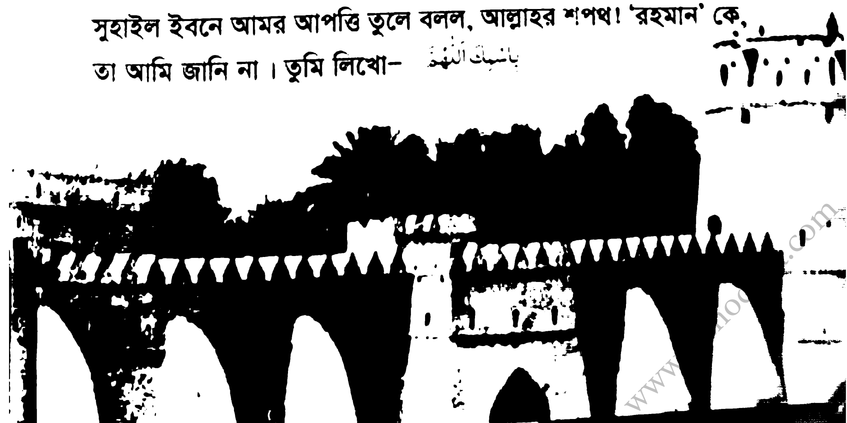
উরাইয তাকে থামিয়ে দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল– সত্যিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন? আবু বকর, ওমর (রা.)-এর উপস্থিতিতেও তিনি নারীদের রায় মেনে নিতেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। জবাবে সারা বলল– তুমি উম্মে সালমা রা. এর ঘটনা শোনোনি? যিনি মুসলমানদের সামনে উদ্ভূত জটিল একটি বিষয়ের সহজ সমাধান বের করে দিয়েছিলেন। পৃথিবী আজ নারী অধিকারের বুলি আওড়াচ্ছে। অথচ এ ঘটনাটি হাজার বছর পুরনো।

কি সেই ঘটনা? উরাইযের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

সারা বলতে লাগল– তখনও মক্কা বিজয় হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত সাহাবীর এক বিশাল জামাত নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তখন মক্কায় ছিল কুরাইশদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে মক্কায় প্রবেশ ছিল দুঃসাধ্য। তারা যাকে খুশি প্রবেশের অনুমতি দিত আর যাকে খুশি দিত না। মুসলমানরা তো আর লড়াই করতে আসেনি। অন্যান্যদের মতো তারাও ওমরা পালন করতেই এসেছিল। কিন্তু কুরাইশরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে জোরপূর্বক প্রবেশ করার কথা ভাবলেও পরক্ষণে সন্ধি করার চিন্তা করলেন। কুরাইশরা সন্ধিনামার শর্ত স্থির কল্পে কয়েকজনকেই পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। পরিশেষে সুহাইল ইবনে আমর সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করতে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতেব (লেখক) কে ডাকলেন এবং বললেন, লিখো– بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুহাইল ইবনে আমর আপত্তি তুলে বলল, আল্লাহর শপথ! 'রহমান' কে, তা আমি জানি না। তুমি লিখো– بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ



মুসলমানেরা ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - ই লিখবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ -ই লিখো। তারপর বললেন, এখন লিখো–

'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সন্ধিনামায় এই শর্তগুলো স্থির করেছেন।

সুহাইল ইবনে আমর এবারও আপত্তি তুলল এবং বলল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করতাম তাহলে না আপনাকে বাইতুল্লায় প্রবেশে বাঁধা দিতাম, না আপনার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতাম। অতঃপর সে কাতেবকে বলল– তুমি 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যতই আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করো না কেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তাঁরই রাসূল।
কাতেবকে বললেন, আচ্ছা, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ-ই লিখো।



তারপর বললেন, এখন লিখো শর্ত হলো এই- আপনারা আমাদের ও বাইতুল্লার মাঝ থেকে সরে যাবেন। যেন আমরা বিনা বাধায় বাইতুল্লার তাওয়াফ করতে পারি।

সুহাইল ইবনে আমর বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা কিছুতেই হবে না। কারণ, তাহলে আরবরা বলবে যে, আমি ভীত হয়ে এরূপ করেছি। এ কাজ আপনারা আগামী বছর এসে করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে আমরের কথা মেনে নিয়ে কাতেবকে অনুরূপ লিখতে বললেন। সুহাইল মুসলমানদেরকে চাপে ফেলার জন্য আরেকটি শর্ত দিলো যে, মক্কা থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদিনায় চলে গেলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। তবে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে মদিনা থেকে মক্কায় চলে আসে, তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

মুসলমানদের পেরেশানি এবার চরমে পৌঁছল। তারা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে আসবে তাকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে- এটা কেমন শর্ত?

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শর্তটিও মেনে নিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে তাদের কাছে চলে যাবে, তাকে আল্লাহ ধ্বংস করুন।

সন্ধির শর্তাবলি স্থির হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সাথে এই সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে, মুসলমানেরা এ বছর মদিনা ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে ওমরা পালন করবে।



মুসলমানেরা এক বুক আশা নিয়ে ওমরার এহরাম বেঁধে এসেছিল। কিন্তু কুরাশইদের বাঁধার মুখে তাদের সব আশা নিরাশায় রূপ নিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধিনামার যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন শেষে সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা আপন আপন কোরবানীর জন্তু জবাই করে নাও এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো। দুশ্চিন্তার অতলে ডুবন্ত মুসলমানেরা চুপ করে বসে রইল। কেউ এক চুলও নড়ল না। তাদের আশা ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি নিয়ে আরেকবার ভাববেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন। তিনি পুনরায় সবাইকে একই আদেশ দিলেন। কিন্তু এবারও কেউ সাড়া দিলো না। অতঃপর তিনি রাগান্বিত হয়ে হযরত উম্মে সালমা রা. এর তাবুতে চলে গেলেন। এবং তাকে বললেন, মুসলমানদেরকে আদেশ দিচ্ছি অথচ তারা তা মানছে না।

উম্মে সালমা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি চান যে, মুসলমানেরা আপনার কথা মানুক, তাহলে কোনো কথা না বলে আপনি গিয়ে আপনার কোরবানির জন্তু জবাই করুন এবং একজন নরসুন্দর ডেকে মাথা মুণ্ডন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করলেন। নিজের কোরবানীর জন্তু জবাই করলেন এবং নরসুন্দর ডেকে মাথা মুণ্ডন করিয়ে নিলেন। মুসলমানেরা এ দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ সবাই উঠে দাঁড়াল এবং একে একে সকলেই নিজ নিজ কোরবানীর জন্তু জবাই করে মাথা মুণ্ডন করে নিল। *(বুখারী : হাদিস নং ২৭৩১-২৭৩২)*



দেখেছো, একজন নারীর স্বীয় মতামতের উপর আত্মবিশ্বাসের নমুনা! তিনি নিজেকে তুচ্ছ ভাবেননি; বরং পূর্ণ নির্ভরতার সাথে নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর সবাই তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে কিভাবে তা বাস্তবায়ন করেছেন।

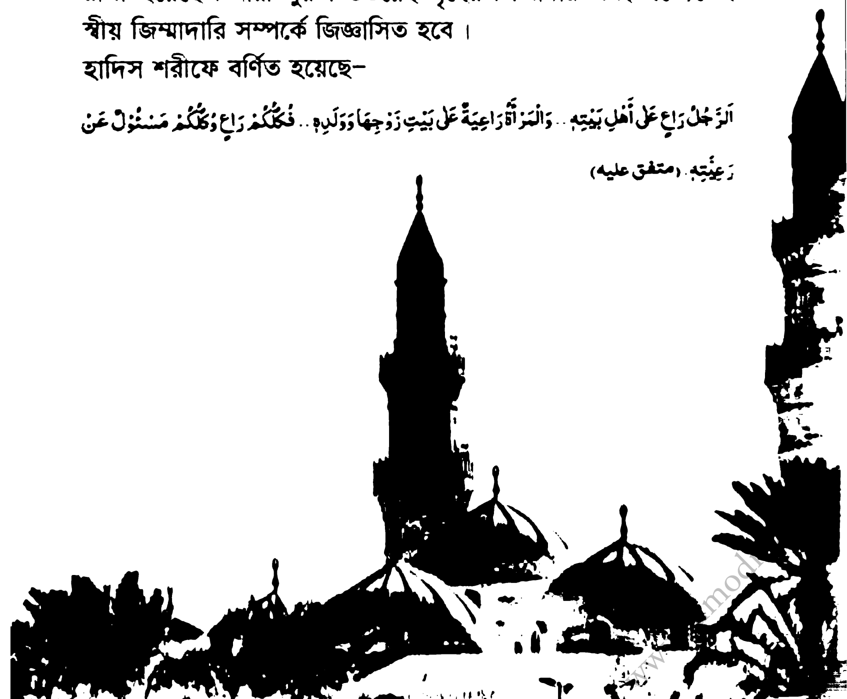
সত্যিই চমৎকার! বলল উরাইয।

দায়িত্বে সমতা

সারা তার পূর্বের কথায় ফিরে আসল। তো আমি বলছিলাম আল্লাহ তাআলা প্রায় সব বিষয়েই নারী-পুরুষের সমতা বিধান করেছেন। কেবল যেসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহজাত প্রকৃতি ভিন্নতার দাবিদার সেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য স্থির করেছেন। বাইয়াতের ব্যাপারে অভিন্নতার উল্লেখ রয়েছে। গৃহ কার্যের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে সমতার বিধান রাখা হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়েই গৃহের জিম্মাদার এবং প্রত্যেকেই স্বীয় জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهٖ .. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ .. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ. (متفق عليه)



'পুরুষ পরিবারস্থ লোকজনদের জিম্মাদার। আর নারী তার স্বামীর ঘর এবং তার সন্তানাদির জিম্মাদার। আর প্রত্যেকেই স্বীয় জিম্মাদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইবাদত বন্দেগিতে সমতা

ইবাদত এবং শরিয়তের বিধি-বিধান পালনেও নারী-পুরুষের মাঝে সমতা রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা, যাকাত ও হজ্জ নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্বেই ফরজ। কিন্তু ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে নারীদের সহজাত প্রকৃতি কিঞ্চিৎ শীথিলতা চায়, তাই আল্লাহ তাআলা এই সময়গুলোতে নামায-রোযা পালনে তাদেরকে শীথিলতা দিয়েছেন। পৃথিবীতে মানব-বংশ বৃদ্ধির গুরু দায়িত্ব রয়েছে নারী-পুরুষের কাঁধে। আর উভয়কেই জীবিকা অন্বেষণে চেষ্টা-তদবির করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَامْشُوا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

'অতএব তোমরা তাঁর পথেঘাটে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর।' *(সূরা মুলক, আয়াত : ১৫)*

আর নারী-পুরুষ উভয়েই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে আদিষ্ট।



لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم
مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ

আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করিনা, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। (সূরা আল ইমরান : ১৯৫)

আল্লাহ তাআলা

যেমনটি বলেছেন-

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

(তরজমা) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিরকরকারী পুরুষ ও যিরকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

(সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

(তরজমা) 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।' *(সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬)*

অনেক মহিয়সী নারী তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন।

কিছু ঘটনা

সারা বলতে লাগল– আমার পরিচিত এক বোন এক মহিলা হিফজুল কোরআন মাদরাসার পরিচালক ছিল। ঘটনাটি তার মুখ থেকেই শোনা। সূচনা কালে মাদরাসাটি সড়ক থেকে খানিকটা উঁচুতে ছিল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হতো। ভর্তির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা ভর্তি হতে এলো। সে হুইল চেয়ারে বসা ছিল। তার মেয়ে তাকে নিয়ে এসেছিল।

হুইল চেয়ারটি সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছার পর বৃদ্ধা মহিলাটি একবার মেয়ের দিকে ও একবার সিঁড়ির দিকে তাকালো। তারপর হুইল চেয়ার থেকে নেমে গেল এবং হাঁটুর উপর ভর করে বহু কষ্টে হেঁচড়ে হেঁচড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। ভর্তি হয়ে আবার সেভাবেই চলে গেল।



আমি আরেক সাহসী নারীর সংগ্রামী জীবন গাঁথা শুনেছি। এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল সে। পনের বছর ধরে শয্যাই তার সঙ্গী। দেহময় বড় বড় যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়ার বসতি। শরীর অচল হলেও বিবেক ছিল তার সচল। হৃদয় ছিল ঈমানের আলোয় আলোকিত। ইসলামের সেবায় নিজেকে উজাড় করার জন্যে ছিল উদগ্রীব। তাই সাধ্যের ভেতর কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। তার গৃহিত উদ্যোগগুলো এমন ছিল–

১. সে তার ঘরের দরজা নারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিল। যেন তারা তার অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২. নিজের ঘরটি অভাবীদের সাহায্যে ওয়াকফ করে দিল। যার ইচ্ছা তার দানের সামগ্রী এখানে রেখে যাবার ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল তা গরীব-দুঃখীদের মাঝে সুষ্ঠু বণ্টনের পূর্ণ নিশ্চয়তা। সুতরাং তার ঘরের আঙিনা দান-সদকার বস্তুতে সদা ভরপুর থাকত। যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রকৃত অভাবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। আর এভাবেই কতো চুলায় আবার আগুন জ্বলল। কতো ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণ হলো। কতো বস্ত্রহীনের বস্ত্র মিলল। কতো রোগী সুস্থ হলো তার গোনা-গুনতি নেই।





৩. প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণকালে সে কিছু উপকারী বই-পুস্তক ও ক্যাসেট দিয়ে দিত। সেই বই ও ক্যাসেট সবাই পড়ে ও শোনে কি না সে নিয়েও তার চিন্তার অন্ত ছিল না। তাই এ বিষয়েও যথাসাধ্য খোঁজ-খবর নিতো এবং বইগুলো পড়তে ও ক্যাসেটগুলো শুনতে সবাইকে উৎসাহ দিত।

৪. আগন্তুক নারীদের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার করে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ'–এর দায়িত্ব পালন করত।

৫. বিবাহপযুক্তা যেসব নারীদের বিবাহ হচ্ছিল না, যারা বিবাহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে বাপ-ভাইয়ের গলার কাঁটা হয়ে ঝুলছিল– পরিচিতজনদের সহায়তায় সে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করাতো।

৬. দাম্পত্য জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানে সে নারীদের সাহায্য করত।

আল্লাহর শপথ! বিস্ময়ের আঁধার ছিল সে নারী।

কথাগুলো উরাইযের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। মনে দাগ কেটে গেল। তার মাথায় শতবার শোনা সেই কথাটি বারবার গুঞ্জরিত হচ্ছিল যে, নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারীরা আজ সর্বত্র অত্যাচারের শিকার। পুরুষ শাসিত এই সমাজ ব্যবস্থায় তাদের অধিকার আজ চরমভাবে বিনষ্ট। তারা মুক্ত আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায়, কিন্তু তাদেরকে উড়তে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ডানা কেটে দেওয়া হচ্ছে। তাই সারার কথা শুনে অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– বাহ! কি চমৎকার!

সারা আবার বলতে লাগল– তোমাকে আরেকটি তথ্য দিচ্ছি; কোরআন-হাদিসে ব্যবহৃত "يَآيُّهَا النَّاسُ" শব্দ দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বিশ বা ততোধিক স্থানে নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করে "يَآيُّهَا النَّاسُ" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ.

'হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর'। ***(সূরা বাকারা, আয়াত : ২১)***

يَآيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا

'হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর'। ***(সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮)***

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا

'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকি (খোদাভীরু)।' ***(সূরা হুজরাত, আয়াত : ১৩)***

আর এই শব্দটি দ্বারা যে নারী-পুরুষ যুগলই উদ্দেশ্য তার প্রমাণে তোমাকে আরেকটি ঘটনা শোনাচ্ছি–



একদা আম্মাজান উম্মে সালমা রা. খাদেমা দ্বারা মাথার কেশ পরিপাটি করাচ্ছিলেন। তার ঘরটি ছিল মসজিদ সংলগ্ন। এ সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে তাশরিফ আনলেন এবং মানুষদেরকে "يَاأَيُّهَا النَّاسُ" বলে ডাক দিলেন। উম্মে সালমা রা. খাদেমাকে থামো বলে মসজিদে যাবার জন্যে দাঁড়ালেন। খাদেমা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো পুরুষদেরকে ডেকেছেন। জবাবে উম্মে সালমা রা. বললেন, النَّاسُ (লোক সকল)-এর মধ্যে আমিও অন্তর্ভূক্ত। *(মুসলিম শরিফ, হাদিস নং ১৭৮৪)*

উরাইয বলল, সারা, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

একটু থামো। নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক আলোচনা প্রায় শেষ। বলল সারা।

ঠিক আছে বলো।

শরিয়তের আবশ্যকীয় বিধানাবলী পালনে নারী-পুরুষ সবাই সমান। তদ্রূপ আমলের প্রতিদান প্রাপ্যের ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে নেই কোনো বিভেদ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব, যা তারা করত।'

(সূরা নাহল, আয়াত : ৯৭)



আরো ইরশাদ হয়েছে–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

'অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক।' ***(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯৫)***

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

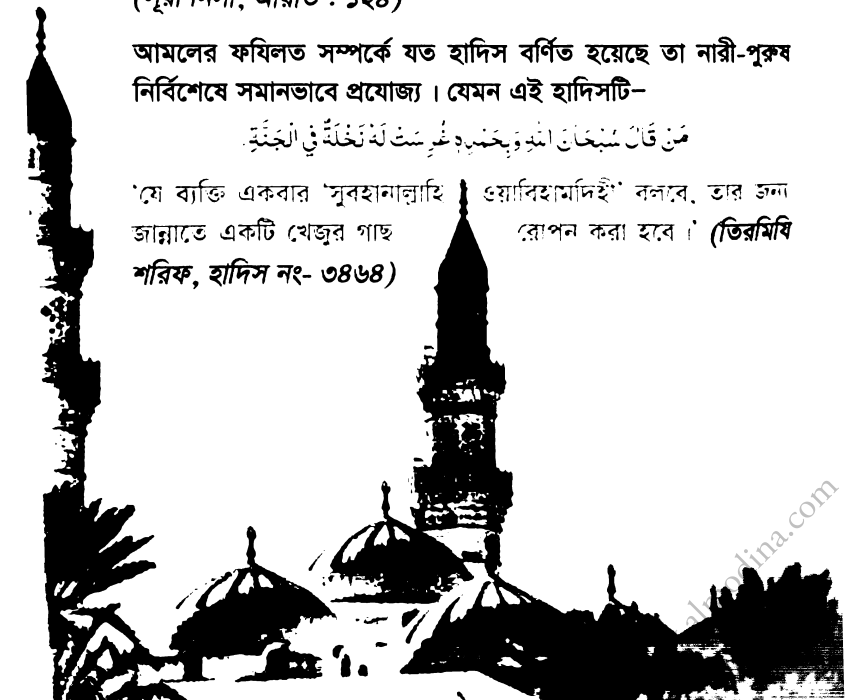
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

'যে পুরুষ কিংবা নারী কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।' ***(সূরা নিসা, আয়াত : ১২৪)***

আমলের ফযিলত সম্পর্কে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন এই হাদিসটি–

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি একবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' বলবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হবে।' ***(তিরমিযি শরিফ, হাদিস নং- ৩৪৬৪)***





নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই এই সাওয়াবের ঘোষণা। কোন নারী যদি আল্লাহর হামদ-ছানা পড়ে তবে সেও পুরুষের মতোই সাওয়াব লাভ করে। অন্য এক হাদিসে এসেছে–

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'যে মুসলিম বান্দা প্রতিদিন ফরয নামায ছাড়া আল্লাহর জন্যে বারো রাকাত নফল নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন'। ***(মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৭২৮)***

নেক আমলের উত্তম প্রতিদান ও বদ আমলের কঠিন শাস্তির ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ বরাবর। আল্লাহর অবাধ্যতার সাজা উভয়ের জন্যেই অভিন্ন। উদাহরণতঃ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪

'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর।' ***(সূরা নূর, আয়াত : ২)***

চুরি সম্পর্কে বলেছেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

'যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও।' *(সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩৮)*

শিরক ও নিফাক সম্পর্কে বলেছেন–

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

'যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা আহযাব, আয়াত : ৭৩)*

মানবজাতির মর্যাদা সম্পর্কিত বর্ণনায় নারী-পুরুষকে এক কাতারে রেখেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۞



'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' *(সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোনো মুসলমানকে অসম্মান বা অবজ্ঞা করাকে হারাম বর্ণনা করে নারী-পুরুষের সাম্যতা অক্ষুন্ন রেখে বলেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

'হে মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।' *(সূরা হুজরাত, আয়াত : ১১)*



মর্যাদার মানদণ্ড খোদাভীরুতা

উরাইয পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সারার তথ্যনির্ভর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা তন্ময় হয়ে শুনছিল। খানিকটা উত্তাপ মাখা কণ্ঠে সারা বলে চলছিল- এই লোকেরা ন্যায়পরায়ণ প্রভুকে জালেম মনে করে। তাঁর প্রদত্ত বিধানে দোষারোপ করে বলে ইসলাম নারীদের ন্যায্য অধিকার হরণ করেছে।

অতঃপর সারা বিজ্ঞ আলেমের মতো পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, নারী-পুরুষের একে অন্যের ওপর প্রাধান্যের একটাই মানদণ্ড, আর তা হলো- তাকওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

'يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ'

'হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক মুত্তাকি (খোদাভীরু)।'

অর্থাৎ, দৈহিক সামর্থ্য, সম্পদের প্রাচুর্য, পুরুষালি শক্তিমত্তা কোনোকিছুই মর্যাদা ও মহত্ত্বের মাপকাঠি নয়। মর্যাদা হ্রাস-বৃদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি হলো- তাকওয়া।

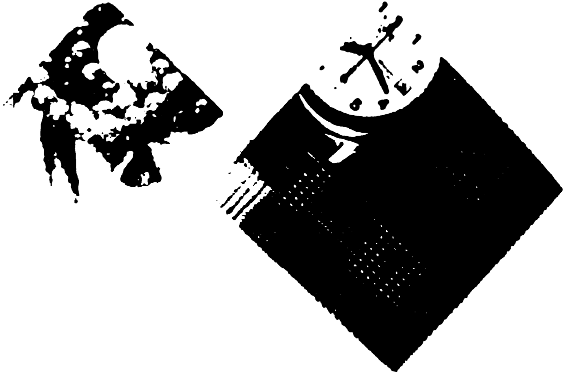
সারার কথায় উরাইযকে খানিকটা প্রভাবান্বিত মনে হলো। মুগ্ধতার রেশ কাটিয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে সে বলল, আহা! অবলা, সরলা যেসব বোনেরা আজ নারী-স্বাধীনতার ফাঁকা বুলি শুনে প্রতারণার শিকার হচ্ছে– তারা যদি এ কথাগুলো বুঝতে পারতো। হায়! তারা যদি এ কথা অনুধাবন করতে পারতো যে, তাদের সাথে আল্লাহর কোনো শত্রুতা নেই। পুরুষের মতো তারাও আল্লাহর সৃষ্টি। তারা চাইলে তাকওয়া-পরহেযগারীতার ময়দানে পুরুষ থেকেও অগ্রগামী হতে পারে। একদম ঠিক বলেছ। উরাইযের কথায় একাত্মতা প্রকাশ করে সারা বলল, আমি তোমাকে আরেকটি বিষয় অবগত করছি।

দেখো, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা উভয়ের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী।' *(সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৮)*

হাকিম ইবনে মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কি? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে যখন খাবে তখন স্ত্রীকেও খাওয়াবে এবং যখন নিজে পরিধান করবে তখন স্ত্রীকেও পরিধান করাবে'। *(আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং-২১৪২)*



অপর বর্ণনায় এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মনে রেখো, স্ত্রীদের উপর যেরূপ তোমাদের অধিকার রয়েছে, তদ্রূপ তাদেরও তোমাদের ওপর রয়েছে অধিকার'। *(তিরমিযি, হাদিস নং- ১১৬৩)* পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বাবা-মা দু'জনকেই শ্রদ্ধা-সমীহ করার আদেশ দিয়েছেন।

আর এক্ষেত্রেও তিনি মায়ের হকের ব্যাপারে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। বলেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسٰنًا ۚ

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি' *(সূরা আহকাফ, আয়াত : ১৫)*

তারপর 'حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا' 'তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে'–বলে মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে গর্ভকালীন সময়ে তার কষ্টের কথা বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পক্ষ থেকে উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন, তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা। চতুর্থবার বললেন, তোমার বাবা। ***(বুখারী শরিফ, হাদিস নং- ৫৯৭১ এবং মুসলিম শরিফ, হাদিস নং- ২৫৪৮)***

লাল পাজামায় মিহা

সারা-উরাইযের আলোচনার গাড়ি বিরামহীন চলছিল। ইতোমধ্যে উরাইযের বোন মিহা তাকে খুঁজতে বেরুলো। মিহার পরিধেয় বোরকাটি ছিল খুবই সঙ্কুচিত ও অন্তর্শোভা পরিদৃশ্যকারী। যা শরীরের আকার ও দেহের প্রলুব্ধকর অঙ্গগুলোকে প্রস্ফুটিত করে রেখেছিল। হাঁটার সময় বোরকার নিচে পরিহিত লাল পাজামাটিও দৃশ্যমান হচ্ছিল। পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি তার পিছু পিছু ছুটছিল।

মিহা ওয়েটিং রুমে ঢুকে উরাইযকে এখানে বসে থাকতে দেখে খুবই অবাক হলো। তারপর সালাম দিয়ে সারার সাথে হাত মিলালো। পরিচয় পর্ব শেষে আলোচনা শুনতে ওদের পাশেই বসে পড়ল।





ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে তখন ওদের মাঝে আলোচনা হচ্ছিল। মিহার কানে কয়েকটি শব্দ পৌঁছুতেই ওর বিরক্তি চরমে ওঠল। ক্ষোভ ঝরানো স্বরে বলল, সারা! দেখো ভাই, একটা বিষয়তো পানির মতো পরিষ্কার। তা হলো– অনেক নারীই আজ জ্ঞানে-গুণে পুরুষের চেয়ে শীর্ষে এবং যাপিত জীবনে পুরুষের চেয়ে সফল।

আচ্ছা, তুমি এবং তোমার মতো মেয়েরা নারী-পুরুষের মাঝে এতো বৈষম্য খুঁজে বেড়াও কেন? সর্বক্ষেত্রে পুরুষের অগ্রাধিকার কামনা করো কেন? কেন চাও তাদের জন্য পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করতে? কেন সারাক্ষণ তোমরা পুরুষ, পুরুষ জপতে থাকো?

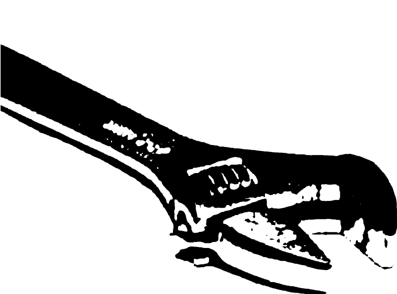
মুখের মানচিত্রে হাসির রেখা ফুটিয়ে সারা বলল, আমরা তো নারী নারী বলেও জপি। দেখো মিহা! সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তাআলা নারী-পুরষের মাঝে পার্থক্য রেখেছেন। তাদের শারীরিক অবকাঠামো, আকার-আকৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতির মাঝেও রয়েছে পার্থক্যের প্রকাশ। দৈহিক শক্তিমত্তায় পুরুষ এগিয়ে, তবে আবেগ-অনুভূতিতে কম।

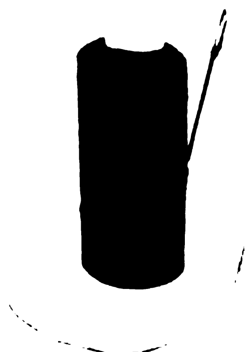


বিপরীতে নারীরা আবেগ-অনুভূতিতে অগ্রগামী হলেও শারীরিক শক্তিতে ক্ষীণ। আর জীবন চলার পথে নারী-পুরুষ দুজনেই আপন সামর্থ্য অনুসারে কাজ করবে– এটাই কাম্য।

সেটা কিভাবে? প্রশ্ন মিহার।

বিষয়টি সবিস্তারে বুঝাতে সারা বলল, নারীদের কিছু বিশেষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে। প্রত্যেক মাসের বিশেষ কিছু দিন তাকে অসুস্থ থাকতে হয়। গর্ভধারণের কষ্ট সইতে হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তন্যদান করতে হয়। সন্তানকে লালন-পালন করতে হয়। এ জন্যেই তাকে হযরত আদম আ. এর বাম পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে; অন্তরের খুব কাছেই যার অবস্থান। অন্যদিকে পুরুষকে পরিবার ও স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব বহন করতে হয়। তাই তাকে মাটি থেকে সুদৃঢ়রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সৃষ্টিগত এই পার্থক্যের কারণে নারী-পুরুষের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যের মাঝে তারতম্য হয়ে গেছে।





এই তারতম্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের ওপর ইসলামী শরিয়তের কিছু বিধি-বিধান প্রয়োগে ভিন্নতা এসেছে। পুরুষ যেহেতু সৃষ্টিগতভাবেই শারীরিক শক্তিতে বলিয়ান তাই তাকে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ঘরের বাইরে বেরুতে হয় এবং উদ্ভূত সমস্যাবলি সামাল দিতে হয়।

পক্ষান্তরে আবেগ-অনুভূতির প্রাবল্যের কারণে বাচ্চা-কাচ্চা লালন-পালন ও গৃহাভ্যন্তরের ক্রিয়া-কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য পুরুষের তুলনায় নারীর অধিক বিধায় ঘরের ভেতরকার দায়-দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়েছে। হযরত মারইয়াম আ. এর মা একজন নারী হয়েও তা সহজে বুঝতে পেরেছিলেন এবং বলেছিলেন–

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

'সে কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই।'

মিহাকে দেখে মনে হলো সে তার কথায় খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই সারা মিহার দিকে তাকিয়ে বলল, মিহা! মনে করো তুমি একজন স্কুল-শিক্ষিকা। তুমি চাইলে স্কুলে একটা পার্টি দিতে।

এখন পার্টি রুমটির পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে চার্ট তৈরী করা, নোটিশ বোর্ডে নোটিশ লাগানো, প্রশংসানামা প্রস্তুত করণ ও পাঠসহ যাবতীয় কাজের দায়-দায়িত্ব তোমার কাঁধে। তোমার ক্লাশে বিশজন ছাত্রী আছে যারা একেকজন একেক রকমের কাজ সম্পাদনের সামর্থ্য রাখে। তাদের মধ্যে বেটে স্থুলকায়, ছিপছিপে লম্বা, বিশুদ্ধ ভাষী, সাহসী, লাজুক সব ধরণের ছাত্রী আছে। এখন চেয়ার অথবা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নোটিশ ঝুলানোর কাজটি তুমি কার দ্বারা করাবে? বেটে স্থুলকায় ছাত্রীটি দ্বারা?

একদম না। মুচকি হেসে মিহা বলল, বরং ছিপছিপে গড়নের লম্বা ছাত্রী-টির দ্বারাই করাবো।

আর পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটির জন্য তুমি কাকে বেছে নেবে? বিশুদ্ধ ভাষী, সাহসী ছাত্রীটিকে?

কখনওই না। মিহার তাৎক্ষণিক জবাব। বিশুদ্ধভাষী ছাত্রীটিকে দিয়ে আমি প্রশংসানামা পাঠ করাবো।

এবার বলো, ছাত্রীদের মাঝে এ পদ্ধতিতে কাজ বণ্টন করে দেওয়াটা ভুল হবে না তো? প্রশ্ন সারার।

না, কোনক্রমেই না। বরং ইনসাফ ভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের ফলে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজটি চমৎকারভাবে সম্পন্ন হবে। বলল মিহা।

সারা বলল, বেশ, এবার বলতো স্থুলকায় ছাত্রীটি যদি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জানায়, লাজুক ছাত্রীটিও আপত্তি তোলে, লম্বা ছাত্রীটিও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, বিশুদ্ধভাষী ছাত্রীটিও প্রশংসানামা পাঠে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তুমি কি করবে?

তখন আমি কিছুতেই তাদের আপত্তি গ্রহণ করব না। মিহার কণ্ঠে দৃঢ়তা। কারণ, প্রতিটি ছাত্রীকেই তাদের সামর্থ্যভুক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই দায়িত্ব-বৈষম্যের প্রশ্ন ওঠার কোনো সুযোগ নেই।

সারা এটাই শুনতে চাচ্ছিল। তাই বলল, ঠিক এভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ের সহজাত স্বভাব ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করেই দুজনের দায়িত্বে ভিন্নতা রাখা হয়েছে। তোমার এতে আপত্তি কেন?

উরাইযও তখন মিহার মতোই ভাবছিল। তাই সে জিজ্ঞেস করল, সারা! তাহলে কি নারীদের জন্যে ঘর থেকে বের হওয়া হারাম?

সারা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, না! আমি একথা কখন বললাম যে, নারীরা ঘরের বাইরেই পা ফেলতে পারবে না?

উরাইয বলল, কিন্তু আজকাল তো পুরুষালী বহু কাজই নারীরা আঞ্জাম দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তা পুরুষদের চেয়েও সুন্দর-সুচারু হচ্ছে।



সারা বলল, এ কথা ঠিক। আমিও তোমার সাথে একমত। কিন্তু তুমি বলতো, যদি কোনো গ্যারেজে কোনো নারীকে তুমি গাড়ি বা ট্রাকের টায়ার খুলতে বা বদলাতে দেখো তখন তোমার কেমন লাগবে? কিংবা কোনো নারীকে প্রতিদিন আট ঘণ্টা ক্রেন চালাতে অথবা দূর্ঘটনা কবলিত গাড়িকে টেনে তুলতে, ব্রিজ নির্মাণের কাজ করতে কিংবা সিমেন্টের থলি ধুতে দেখো, তাহলে কি তুমি অবাক হবে না?

সারার চমকপ্রদ উদাহরণ শুনে উরাইয এবং মিহা দুজনেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

এটা তো স্পষ্ট বিষয়। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বিবেকবান প্রতিটি মানুষই বোঝে যে, এগুলো নারীদের উপযোগী কাজ নয়। নারীদের স্বভাব, শক্তি, সামর্থ্যের আওতাভূক্ত নয় এগুলো। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো নারী এসব কাজে যোগ দেয়, তাহলে ধীরে ধীরে তার দেহের কোমলতা, ত্বকের লাবন্যতা ও নারী সুলভ কমণীয়তা হারিয়ে যাবে।







সারা তার পূর্বের কথার সূত্র ধরে বলতে লাগল, বিপরীতে তুমি এমন পুরুষের কথা কল্পনা করে দেখো তো, যে ঘরের কোণে বসে বসে বাচ্চার জন্য দুধ বানাচ্ছে, তাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, বাচ্চা কেঁদে উঠলে তাকে খেলনা দেখিয়ে, গান শুনিয়ে মন ভোলাচ্ছে, রাতে ঘরে চোর আসার পর চোরকে ধরার জন্য সে তার স্ত্রীকে ডাকছে আর নিজে বাচ্চাদের সাথে গলা মিলিয়ে চিৎকার-চেচামেচি করছে।

উরাইয আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলল, চিৎকার-চেচামেচি তো মহিলাটি করার কথা। আর পুরুষের কাজ চোরটিকে ধরা।

সারা বলল, কেন? সমান অধিকারের প্রশ্ন ভাই। নারী-পুরুষ দুজনেই তো চোরকে ধরতে পারে এবং চোরের সাথে লড়তে পারে। তাহলে এ দায়িত্ব একা পুরুষের কেন?

ভাই, বড়ই আশ্চর্যের কথা! এবার মিহা মুখ খুলল, আমি বলতে চাচ্ছি-

পুরুষ যদি বাচ্চার জন্য দুধ বানায়, তাকে কোলে নিয়ে তা খাওয়ায়, তার দেখভাল করে ও নারী সুলভ সব কাজ আঞ্জাম দেয়, তাহলে এখন আর বাকী থাকল বাচ্চা গর্ভে নেয়ার কাজটা....

এবার সারার হাসিতে ফেটে পড়ার পালা।

কেন এই বিভেদ

সারা বলল- এখন আমি নারী-পুরুষের কিছু স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত পার্থক্য তুলে ধরছি। ইসলাম নারীকে গৃহিণী বানিয়েছে। তাই পুরুষের জন্য তার স্ত্রী, কন্যা, মা ও পরিবারের অন্যান্যদের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা জরুরী। নারীর খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানের ব্যবস্থাপনায় কোনোরূপ শীথিলতা প্রদর্শন করা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। নারীর সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা এবং তাতে বিন্দু পরিমাণ আঁচ লাগতে না দেয়ার দায়িত্বও পুরুষের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একথাও বলেছেন যে,

من قتل دون عرضه فهو شهيد ..

যে স্বীয় সম্মান রক্ষায় নিহত হলো সে শহীদ। *(মুসনাদে আহমদ, ৩/১৯০)*

আল্লাহ তাআলাও নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছেন। পবিত্র কোরআনের এই বাণী থেকে সেকথাই বোঝা যায়–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

'পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।' *(সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪)*

কারণ গৃহের প্রতিরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের বিষয়টি পুরুষ-সত্ত্বার সাথে মানানসই। পুরুষ বর্হিরণাঙ্গনের যোদ্ধা আর নারী গৃহ নামক রণক্ষেত্রের। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা পুরুষের ওপর আরোপিত অনেক আবশ্যিক কর্ম থেকে নারী সমাজকে মুক্ত রেখেছেন।



উদাহরণতঃ পুরুষের ওপর জিহাদ ফরয, জুমার নামায ফরয , তীব্র গরম কিংবা কনকনে শীতেও মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব ।

কিন্তু সারা! উরাইয সারাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বৈষম্যের আরো দিক আছে । উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক । এ বণ্টন পদ্ধতি কি নারী-পুরুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে না?

না । সারার সরাসরি জবাব । নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ বিচারক । তিনি কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অবিচার করেন না । তার কোনো ফয়সালাই হেকমত শূন্য নয় । তিনি স্বীয় বান্দাদের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক অবগত । ধরো, কোনো ব্যক্তি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলো । আর উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে গেলো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা । এখন এ টাকা থেকে ছেলে মেয়ে দুজনের মধ্যে কে কত পাবে?

সম্ভবতঃ মেয়েটি পাবে পঞ্চাশ হাজার আর ছেলেটি এক লাখ । খানিকটা ভেবে নিয়ে জবাব দিল উরাইয ।

একদম ঠিক বলেছ । এক বছর পর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলো । মহর হিসেবে পেলো পঞ্চাশ হাজার টাকা । এখন তার কাছে কত টাকা হলো ।



এক লাখ। উরাইযের তাৎক্ষণিক জবাব।

বিবাহ-শাদির মামলা। উপহার তো মিলেই। মেয়েটি উপহার হিসেবে পেলো বিশ হাজার টাকা। এখন তার ঝুলিতে জমা হলো কত?

এক লাখ বিশ হাজার। একটুও না ভেবে জবাব দিল উরাইয।

এদিকে তার স্বামী তার জন্য নতুন ঘর বানালো। ফার্নিচার কিনলো। ওলিমা ইত্যাদির সব ব্যয় ভার বহন করল। মেয়েটির সঞ্চিত এক লাখ বিশ থেকে এক টাকাও খরচ হলো না।

অপরদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে এক লাখ পাওয়া ছেলেটিও বিবাহ করল। মহর হিসেবে বউকে দিলো পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঘরের জন্য ফার্নিচার ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ টাকা খরচ হলো ষাট হাজার। বাকী থাকল কত? প্রশ্ন সারার।

থাকবে কি? বেচারা তো আরো দশ হাজার টাকা ঋনী হয়ে গেলো। স্মিতহাস্যে উরাইযের জবাব।

তারপর ঘর চালানো, বাচ্চাদের পড়ালেখার খরচ, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণ সবই ছেলেটির দায়িত্বে। এই সমস্ত খরচাদির কিঞ্চিতও স্ত্রীর উপর বর্তায় না।



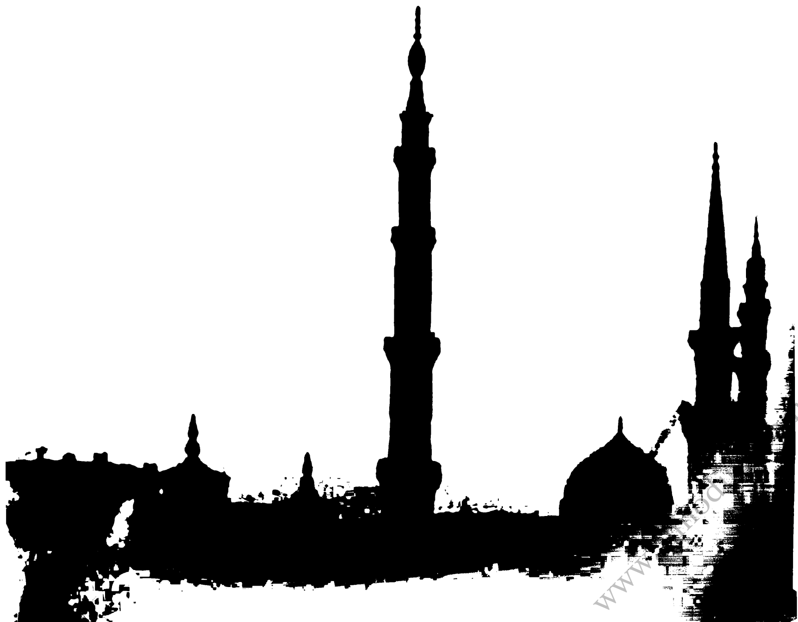
পক্ষান্তরে মেয়েটি তার লাখ টাকা কোনো ব্যবসায় লাগালো। তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বের যথারীতি জিম্মাদার তো স্বামীই। অর্থাৎ, নারীর তুলনায় পুরুষের অর্থনৈতিক জিম্মাদারী বহুগুণে বেশি। পুরুষ তার উপার্জনের বৃহদাংশ তো নারীর পেছনেই ব্যয় করে। সুতরাং কথা সেটাই যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ ٨٣

'নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী'। *(সূরা আনআম, আয়াত : ৮৩)*

বাস্তবিকই আল্লাহর প্রতিটি ফয়সালাই প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং তিনি তাঁর বান্দার প্রয়োজন সম্পর্কে উত্তমরূপেই অবগত আছেন।

সারার যুক্তিপূর্ণ প্রামাণিক আলোচনা উরাইয ও মিহার মনে প্রশান্তির হিমেল হাওয়া বইয়ে দিলো। মহান প্রভুর প্রজ্ঞাপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-পদ্ধতির প্রকৃত রূপ জানতে পেরে তারা অভিভূত হলো।



পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা অবহেলিত বলে প্রকৃত সত্যকে গোপন করে যারা এতোদিন তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে আসছিল, মনের কোণে তাদের প্রতি একরাশ ঘৃণা জন্ম নিলো।

সারা বলল, নারী-পুরুষের মধ্যবার এই প্রাকৃতিক ভিন্নতা ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত। তাই আমাদের উচিত এর ওপর সন্তুষ্ট থাকা। কিছু বিষয় পুরুষের সাথে বিশেষিত আর কিছু একান্তই নারীর সাথে। তাই তাঁর মর্জির উপর রাজি থাকাটাই কাম্য। তাঁর পক্ষ থেকে বণ্টিত নির্ধারিত বিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সেজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

'আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমনসব বিষয়ের যাতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।' *(সূরা নিসা, আয়াত : ৩২)*

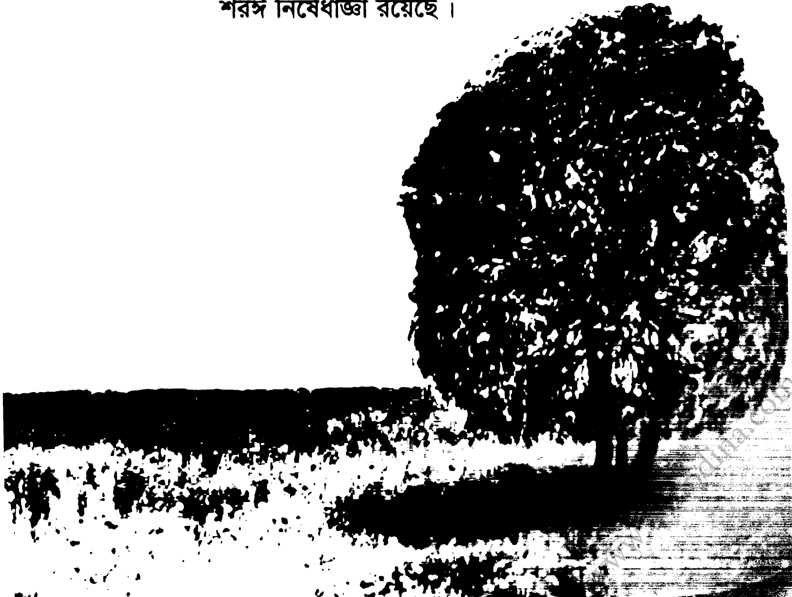
অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা কামনা করতেও নিষেধ করেছেন। আর যারা এর তোয়াক্কা না করে নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান শরঈ পৃথকতাকে অস্বীকার করে এবং নারী-পুরুষের মাঝে সমতা-অসম্ভব বিষয়গুলোতে সমতা স্থির করতে চায় তাদের জন্য করণীয় কি? নারী-পুরুষের মাঝে সৃজনিক ও প্রাকৃতিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যদি শরিয়তের সমস্ত বিধি-বিধান তাদেরকে সমানভাবে পালনের আদেশ দেওয়া হয়, তবে সেটা তাদের উভয়ের জন্যেই জুলুম হয়ে যাবে।

সম্ভবত এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে পর্দা করা ও হিজাব পরার আদেশ দিয়েছেন আর পুরুষেরা যা খুশি পরতে পারে। বলল মিহা।

না, তোমার এ কথা ঠিক নয়। সারা বাঁধা দিলো। পুরুষ চাইলেই যে কোন পোষাক পরতে পারে না।

কিভাবে? মিহার কৌতুহলী প্রশ্ন।

সারা বিষয়টি সবিস্তারে বুঝিয়ে বলতে লাগল, পর্দা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরই ফরয। এমনকি পুরুষ পুরুষের সাথে ও নারী নারীর সাথেও পর্দা করা জরুরী। পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্ত্রী ব্যতিত সবার সামনে ঢেকে রাখা আবশ্যক। সন্তানের বয়স দশ বছর হয়ে যাওয়ার পর তাকে মা-বাবার সাথে এক বিছানায় শোয়ানোর ব্যাপারেও শরঈ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।



ইসলাম-পূর্ব অজ্ঞতার যুগে আরবের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরিফ তাওয়াফ করত। তারা বলত, আমরা সেসব কাপড় পরে কিভাবে তাওয়াফ করব যেগুলো পরে আল্লাহর নাফরমানি করে থাকি। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন যে, 'আজ থেকে কারো জন্যে উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা জায়েয নেই'। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-৪৩৬৩)*

একাকী কিংবা রাতের আঁধারেও বিবস্ত্র হয়ে নামায আদায় করা বৈধ নয়। এমনকি তিনি নির্জন স্থানেও উলঙ্গ হতে নিষেধ করেছেন, বলেছেন-

فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنَ النَّاسِ.

'মানুষের জন্য আল্লাহকে লজ্জা করা অধিক জরুরী'। *(আবু দাউদ শরিফ, হাদিস নং-৪০১৭)*



হজের মধ্যে ইহরাম পরিধানের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রাখা হয়েছে। ইসলাম পুরুষদেরকে চাল-চলন, কথা-বার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। পুরুষদেকে টাখনু গিরার নীচে পোষাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নারীদেরকে পায়ের পাতাও ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। চাই তা লম্বা পোষাক পরে হোক কিংবা মোজা পরিধান করে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো পর্দাভূক্ত অঙ্গের কোনো অংশ প্রকাশ পেয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে সেদিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে বেগানা নারীদের দিকে তাকাতেও নিষেধ করেছেন।

এমনিভাবে যৌন উদ্দীপক কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি দেওয়াকেও করেছেন হারাম।

মুসলিম নর-নারীকে হারাম থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে পর্দার ভূমিকা অপরিসীম। এটি শরিয়তের অবশ্য পালনীয় বিধানাবলীর একটি। পর্দা যেমন পুরুষদের রক্ষা করে নারীর ফেতনা থেকে, তেমনি নারীকেও রক্ষা করে এ থেকে সৃষ্ট নানা কষ্টদায়ক ব্যাপার থেকে। তবে পুরুষের তুলনায় নারীর জন্য পর্দা করা অধিক জরুরী। কারণ দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টি নারীদের ওপরেই বেশি পড়ে।

তাই আল্লাহ তাআলা নারীর নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার্থে এবং অসৎ লোকের অশিষ্ট আচরণ থেকে নিরাপদ রাখতে নারীকে তার রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে বলেছেন। আর নারীর মুগ্ধ করা সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে চেহারারই অগ্রগণ্য।

আলোচনায় উত্তাপ

উরাইয আপত্তি তুলে বলল, কিন্তু পর্দার মাসআলা নিয়ে তো ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নারী তার পুরো শরীর ঢেকে নিয়ে মুখ ও হাতের তালুদ্বয় খোলা রাখলে সমস্যা কোথায়?

সারা উরাইযের কথার জবাব দেয়ার আগে ঠাট্টা করে বলল, মনে হচ্ছে আমাদের আলোচনা এবার উত্তাপ ছড়াবে। কারণ, এটাই সেই বিষয় যা নিয়ে কথা বলার জন্য আমি তোমার কাছে এসে বসেছিলাম।



বেশ, বেশ। ভেবে নাও, রণাঙ্গণ প্রস্তুত। উরাইযের কণ্ঠে উৎফুল্লতা। আর তুমি নিশ্চিত থাকো, আমি সত্যান্বেষী। উপযুক্ত প্রমাণ পেলে সহজেই মেনে নেবো।

সারা আলোচনার শুরুতেই বলল, নারীদের জন্য চেহারার পর্দা করা জরুরী। চলো, হাদিস কোরআনের আলোকে এর সত্যতা খুঁজে দেখি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুসলিম নারীরা এ বিধান মেনে চলতো। খেলাফতে রাশেদার যুগের মুসলিম নারীদেরও এ ব্যাপারে মত ও পথ ছিল অভিন্ন। বরং হিজরী চৌদ্দ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়– যখন খেলাফতের সূর্য অস্তমিত হয়ে মুসলিম সম্রাজ্য ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল–তখনকার মুসলিম নারীরাও তাদের মুখাবয়ব পর্দায় আবৃত রাখত। বিগত কয়েক বছর ধরে চেহারা উন্মুক্ত রাখার প্রচলন প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

সত্যিই তাই! উরাইযের কণ্ঠে বিস্ময়। আশ্চর্য কথা। তুমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই এ কথা বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন নয়? সারার কণ্ঠে দৃঢ়তা। আমি এ কথা প্রমাণ করতে প্রস্তুত।



নারীদের চেহারা খোলা রাখার প্রবণতা আবহমানকাল থেকে নয়। প্রাচীন কালের মুসলিম নারীরা সবসময় তাদের চেহারা পর্দাবৃত রেখেছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম তাদের কিতাবাদিতে একথা লিখে গেছেন। আমার ঠিক মনে নেই; তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটা ছোট কিতাবে লেখা আছে। কিতাবটিতে নারীদের জন্য শিক্ষণীয়, উপদেশমূলক বহু দিক নির্দেশনা সন্নিবেশিত আছে। নার্সদেরকে দেয়ার জন্য আমি আমার আম্মিকে কয়েকটি বই এনে দিয়েছিলাম। দেখি, কিতাবটির এক আধ কপি পাওয়া যায় কি না।

সারা উঠে চলে গেল। যখন ফিরে আসল তখন তার হাতে একটা ছোট কিতাব। সে বসতে বসতে পড়া শুরু করল–

তৃতীয় হিদায়াত : কতিপয় নারীরা চেহারার পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকে অথচ মুসলিম নারীরা বছরের পর বছর ধরে চেহারার পর্দা করে আসছে। পূর্ববর্তী যুগের ও বর্তমান কালের বহু ওলামায়ে কেরাম এ কথা উল্লেখ করেছেন।



শাইখুল ইসলাম হাফেয ইবনে হাজার রহ. (মৃত্যু : ৮৫২ হি.) লিখেছেন :

لَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا يَسْتُرْنَ وُجُوْهَهُنَّ عَنِ الْأَجَانِبِ.

অর্থাৎ, প্রাচীন ও বর্তমান কালের নারীরা সর্বদাই পরপুরুষদের সামনে চেহারা ঢেকে রেখে আসছে। *(ফাতহুল বারী, ৩৩৭/৯)*

ইমাম গাজালী রহ. বলেন,

لَمْ يَزَلِ الرِّجَالُ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ مَكْشُوْفِي الْوُجُوْهِ. وَالنِّسَاءُ يَخْرُجْنَ مُنْتَقِبَاتٍ.

অর্থাৎ, যুগ যুগ ধরেই পুরুষেরা তাদের চেহারা খোলা রাখত আর নারীরা মুখে নেকাব পরে বাইরে বের হতো।
(ফাতহুল বারী, ৩৩৭/৯)

মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ইমাম সুয়ূতী রহ. (মৃত্যু : ৯১১ হি.) পবিত্র কোরআনের–
يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ('তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়') আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন– 'এটা পর্দার আয়াত, যা সকল নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য'। *(সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৯)*

এ থেকে বোঝা যায় যে, নারীদের জন্য মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা জরুরী।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্বের ওলামায়ে কেরাম ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। পর্দা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তারা মুসলিম নারীদের চেহারা খোলা রাখার মাসআলাকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে লেখেননি এবং এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনায় সময় ব্যয় করেননি। এর কারণ সুস্পষ্ট। সেকালের নারীদের মাঝে চেহারা খোলা রাখার প্রচলন ব্যাপক ছিল না। তাই এ বিষয়ে কলম ধরার প্রয়োজন পড়েনি।

তুর্কিস্থান, মিসর ও সিরিয়ার প্রাচীন চিত্রসম্ভার থেকেও জানা যায় যে, তৎকালীন মুসলিম নারীরা তাদের চেহারা পর্দাবৃত রাখত। এই চিত্রসম্ভার কাসেমির লেখা- مكتب عبنر , আহমদ খালেদের লেখা- كتاب الطاهر الحداد ومسئلة الحداثة এবং মিসর আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা প্রতিটি কিতাবেই দ্রষ্টব্য।

সারার কথা শেষ না হতেই উরাইয বলল, ব্যস সারা! আমি তোমার কথা বুঝে গেছি। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, পর্দার অন্তর্নিহীত অর্থ অনুধাবনে তাদের ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ছিল।

না, না, বিষয়টি মোটেই এমন নয়। উরাইযের কথা সরাসরি নাকচ করে দিয়ে সারা বলল, শরঈ পর্দা কেমন হবে, কি তার শর্ত- এটি সবারই জানা। শরঈ পর্দা বলতে বোঝায়, নারীর সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা এবং পরপুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। আল্লাহ তাআলার আদেশও তাই-

لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

'তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে'। *(সূরা নূর, আয়াত : ৩১)*

কিন্তু আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করার পর এটাও বলেছেন-

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'কিন্তু যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া'। (প্রাগুক্ত)

এর দ্বারা তো চেহারা ও হাতই উদ্দেশ্য। আপত্তি তুলল উরাইয।

না, এর দ্বারা চেহারা ও হাত উদ্দেশ্য নয়। সারা বিষয়টি সবিস্তারে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল- " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " বলে আল্লাহ তাআলা



সৌন্দর্য প্রকাশক সেসব বস্তুকে বাদ দিয়েছেন যা এমনি এমনিই প্রকাশিত হয়ে যায়।

যেমন, নারীর দৈর্ঘ্য ও খর্বতা, কৃশতা ও স্থূলতা প্রভৃতি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব সৌন্দর্য যা অনিচ্ছাবশত প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন, বাতাসের দোলে বোরকার নিচের পোষাক বা দেহের কোনো অংশ দেখা যাওয়া। অর্থাৎ, নারীর সৌন্দর্যের কোনো কিছু অনিচ্ছয়ায় প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি পর্দার হুকুম থেকে বিয়োজ্য। সেজন্যেই আয়াতে আল্লাহ তাআলা " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " বলেছেন " إِلَّا مَا ظَهَرْتْ " 'নারী নিজে যা প্রকাশ করে'—বলেননি। সুতরাং, " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে সৌন্দর্য নারীর স্বেচ্ছা সম্পাদন ব্যতিত এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে যায়।

বাহ! কী চমৎকার বলেছ। সারার আলোচনায় বিমোহিত উরাইযের বিমুগ্ধ উচ্চারণ।

আচ্ছা, চলো এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করি।

কিভাবে পর্দা করব

হিজাবের ক্ষেত্রে সাধারণত জালবাব (বড় চাদর) বা খিমার (উড়না) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আভিধানিক অর্থে 'খিমার' বলা হয়– এমন বস্তুকে যা কোনো কিছুকে ঢেকে ফেলে।



প্রসিদ্ধ একটি হাদিসের বাক্যাংশ এরূপ-

خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ

'তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখো'। *(আল-মু'যামুছ ছগীর লিত তাবরানী, ২/২৭০)*

তাই নেশাজাতীয় দ্রব্যকে 'খিমার' এজন্যে বলা হয় যে, তা বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দেয়। খিমার এরূপ কাপড়কে বলে যা দ্বারা চেহারা, গর্দান, বুক ঢেকে রাখা যায়। (বাংলায় এটিকে উড়না বলে)

খিমার বা উড়না পরিধানের পদ্ধতি হলো- নারীরা এর সাহায্যে শরীরের সেসব অঙ্গ ঢেকে ফেলবে ঘরের ভেতর যা সাধারণত খোলা থাকে। অর্থাৎ, প্রথমে উড়না মাথায় পরে তার এক প্রান্ত দ্বারা নেকাবের মতো করে চেহারা ঢাকবে এবং অপর প্রান্ত দ্বারা ঢাকবে বক্ষদেশ। আর এভাবেই শরীরের সেসব অঙ্গগুলো ঢাকতে হবে যা গৃহাভ্যন্তরে সাধারণত উন্মুক্ত থাকে। এভাবে উড়না জড়িয়ে নারীদের ঘর থেকে বেরুনো উচিত। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উড়নাটি যেন এতটাই পাতলা না হয় যে, তাতে নারীদের মুগ্ধ করা সৌন্দর্যগুলো দৃষ্টিতে পড়ে।

ইমাম আলকামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর তদীয় ফুফি উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট আসলেন। তিনি এমন উড়না পরেছিলেন যে, তার ললাট দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। উম্মুল মুমেনিন সেই উড়নাটি তার থেকে নিয়ে টেনে ছিড়ে ফেললেন।

তারপর ধমকের স্বরে বললেন, আল্লাহ তাআলা সূরা নূরে কি বলেছেন তুমি জানো না?

একথা বলে তিনি আরেকটি উড়না এনে হযরত হাফসাকে পরিয়ে দিলেন। *(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ৮/৭২)*

এটা হলো হিজাবের প্রথম অংশ যা চুল ও মুখাবয়বকে ঢেকে দেয়। হিজাবের দ্বিতীয় অংশ হলো যা দ্বারা গোটা শরীর ঢাকা হয়। সেটাকে

জালবাব বা বড় চাদর বলে। নারীরা এটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরে থাকে। এটা নারীর পুরো শরীর, পরিধেয় বস্ত্র ও সৌন্দর্যকে আড়াল করে ফেলে। (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যাকে বোরকা বলা হয়।)

কিন্তু সারা, আজকাল বহু নারীকে বোরকা পরেও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে দেখা যায়। বলল উরাইয।

মানে? সারা ব্যখ্যা চাইল।

মানে অনেক নারীরাই এমন সঙ্কুচিত বোরকা পরে যার ফলে তাদের দেহের বিমুগ্ধ ভাঁজগুলো বিকশিত হয়ে পড়ে।

সারা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। বর্তমানে এ ধরনের বোরকার ব্যাপকতা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। আমি অনেক ফতোয়ার কিতাবে পড়েছি, এসব বোরকা পরিধান, প্রচলন ও ক্রয়-বিক্রয় সবই নিষেধ। কারণ এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও অন্যায় কাজে সহযোগিতার নামান্তর। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না'। *(সূরা মায়িদা, আয়াত : ২)*

কিন্তু সারা, উরাইয আবার প্রশ্ন তুলল। আমি যদি ঢিলেঢালা বোরকা পরে মেকাপ ছাড়া চেহারা ও হাত খোলা রাখি তাতে সমস্যা কোথায়?

হ্যাঁ, সত্যিই তো, তাতে সমস্যা কোথায়? মিহাও উরাইযাকে সমর্থন জানালো।

ঈষৎ হেসে সারা বলল, সমস্যা তো আছেই।

কি সমস্যা? উরাইযের প্রশ্নে বিস্ময়ের ছোঁয়াচ।

একজন মুসলিম নারী হিসেবে তুমি নিশ্চয় শরঈ দলীলের উপর আস্থাশীল?

হান্ড্রেড পার্সেন্ট। উরাইযের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

তাহলে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। সারা বলতে লাগল। একটু আগেই আমি বলেছি, সাহাবা ও তাবেয়িদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম নারীদের আমল এমনই ছিল যে, তারা নেকাব দিয়ে চেহারা ঢেকে বাইরে বেরুতো। আর উম্মতে মুহাম্মাদির সর্বজনগ্রাহ্য আমলও এটি। এ বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের ওলামায়ের কেরামের বক্তব্যও অভিন্ন। যাদের মধ্যে ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালেকী, ইমাম নববী শাফেয়ী এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ হাম্বলী রহ. এর মতো মহান ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন।



হিজরী চৌদ্দ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে যখন ইসলামী খেলাফতের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো- তখনকার মুসলিম নারীদের আমলও এমনই ছিল।

ক্রমশ এই আপদ তুর্কিস্থান, সিরিয়া, ইরাক হয়ে অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোতে ও ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমদিকে এটি কেবল চেহারা খোলার উপর সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু ধীরে ধীরে গোটা শরীর থেকেই কাপড় হ্রাস পেতে লাগল। পর্দাহীনতার সূচনা একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়েছিল।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে? মিহার কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক তুচ্ছ ঘটনা থেকেই পর্দাহীনতার সূত্রপাত হয়। বলল সারা।

তুমি কি আমাদেরকে সেই ঘটনাটি শোনাবে? প্রশ্ন মিহার।

হ্যাঁ, আমি সেই ঘটনাটি তোমাদের শোনাবো। তোমাদের জানা দরকার বলেই শোনাবো। কারণ, আজ ইসলামী অনেক রাষ্ট্রই সে পথে হাটছে। কিন্তু তার আগে মুসলিম নারীদের জন্য চেহারার পর্দা আবশ্যক কি না সে বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রমাণের আলোকে তুলে ধরতে চাচ্ছি।

এ ব্যাপারে সমস্ত প্রমাণাদি কি তোমার স্মরণ আছে? জানতে চাইল উরাইয।

দ্বিতীয় সাক্ষাত

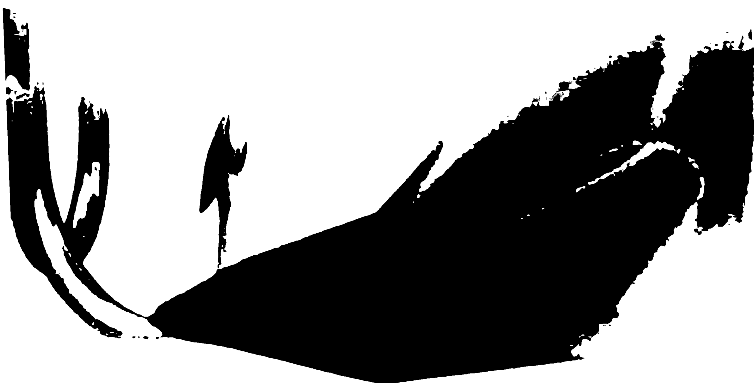
সারা বলল, এই মুহূর্তে তো সবগুলো মনে নেই। তবে গতকাল ভার্সিটিতে কিতাব প্রদর্শনী চলছিল। প্রদর্শনীতে আমি একটি কিতাব দেখেছি। যাতে পর্দা, পর্দা সম্পর্কীত ইতিহাস, পর্দা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় প্রমাণাদি ও পর্দাহীনতার সূচনা সংক্রান্ত সেই ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আজ আসরের পর আমি সেই কিতাবটি কিনতে যাব।

উরাইযেরও আগ্রহ জাগল। সে মিহাকে বলল, মিহা, চলো না আমরাও সেই প্রদর্শনীতে যাই।

কিতাবাদি পড়া বা অধ্যয়নের ব্যাপারে মিহার তেমন ঝোক নেই। তথাপি সে এই ভেবে রাজি হয়ে গেল যে, এই বাহানায় সারার সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সুযোগ মিলবে। আসরের পর প্রদর্শনীতে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে তিনজনই বাড়ির পথ ধরল।

ফেরার সময় উরাইয এবং মিহা দুজনেই সারার কথাগুলো নিয়ে নিজ নিজ বিচারবোধ থেকে বিশ্লেষণ করতে লাগল।

মিহা বলল, আমি ইন্টারনেটে নারীদের ওপর বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার বিষয়ক কয়েকটি আর্টিক্যাল পড়েছি। যেখানে নারীদের প্রতি মায়াকান্না দেখিয়ে লেখা হয়েছে যে, অবলা নারী জাতি আজ চরম অত্যাচারের শিকার। যে কোনো মুল্যেই তাদেরকে এ অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হবে। অনেক ম্যাগাজিনেও এরকম লেখা পড়েছি। কিন্তু আজ আমি বুঝেছি, যা পড়েছি তার সবই ছিল ভুল। একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমি যদি আমার সৌন্দর্য প্রকাশ করে চলি তাহলে লম্পটদের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না। আসতাগফিরুল্লাহ।



মিহার কথা শুনে উরাইয অবাক না হয়ে পারল না। সেইতো মিহাকে সবসময় উপদেশ দিয়ে বলতো– পর্দায় থাকো, সাদাসিধে চলো, সৌন্দর্য প্রকাশক চমকদার পোষাক পরে বাইরে বেরিও না।

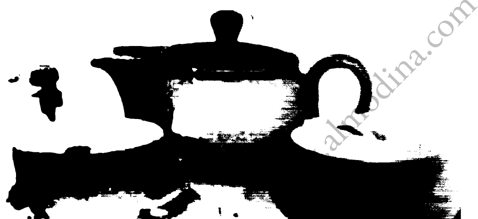
উরাইয মিহার চেয়ে বয়সে যেমন বড়, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধিতেও এগিয়ে।

নামায রোজার ব্যাপারে আন্তরিক থাকলেও পর্দার ব্যাপারে সে বরাবরই ছিল শিথিল। শিক্ষিতা এই মেয়েটি অধ্যয়নে খুব আগ্রহী। পর্দা বিষয়ক অনেক লেখায় সে পড়েছে যে, নারীদের জন্য সাদামাটা পোষাক পরে চেহারা খোলা রাখার বৈধতা রয়েছে। আরো পড়েছে, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে নারীদের জন্য চেহারা অনাবৃত রাখা জায়েয আছে। কেবল সৌদি আরবের আলেমগণ চেহারা খোলা রাখাকে হারাম বলেছেন। পক্ষান্তরে মিসর, সিরিয়া, ইয়ামান, তুরস্ক ও অন্যান্য ইসলামী দেশের আলেমগণ এটাকে জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন। সে কোথায় যেন এটাও পড়েছে যে, চেহারা ঢেকে রাখাটা দীনের আওতাভূক্ত কোনো বিষয় নয়। বরং এটি আবহমান কাল ধরে চলে আসা একটি রীতি মাত্র।

সারার সপ্রমাণ সরল কথাগুলো উরাইযকে সবকিছু নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। তার সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে দ্বিতীয়বার পরখ করে দেখতে এবং আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে যত কিছু পড়েছে সঠিকতার মানদণ্ডে তা যাচাই করে নিতে তাগিদ দিচ্ছে। সে বুঝতে পারছে, এ বিষয়ে তার মেনে আসা মত ও পথ কোনটিই নির্ভূল নয়।

ঘড়িতে সময় বিকাল চারটা। সারা ভার্সিটির উদ্দেশে বেরুলো। উরাইয ও মিহাও ভার্সিটির দিকে রওয়ানা হলো। সারাদের ভার্সিটিতে প্রতি বছরই এই অনাড়ম্বর কিতাব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভার্সিটির স্টুডেন্ট ছাড়াও বহিরাগত অনেক নারী এই প্রদর্শনী দেখতে আসে।

সারা একটু জলদি পৌঁছে গেলো। এসেই প্রথমে সেই কিতাবটি কিনে ফেলল। উরাইয ও মিহার আগমনে বিলম্ব দেখে সে কিতাবটিতে চোখ বুলাতে লাগল। ইত্যবসরে উরাইয ও মিহা এসে গেলো। সারা আলোচনার দৈর্ঘের কথা ভেবে তাদের দুজনকে নিয়ে ভার্সিটির ক্যান্টিনের দিকে চলল।





ভার্সিটির ক্যান্টিনে

ভার্সিটির ক্যান্টিনটি যথেষ্ট প্রসস্ত। চারিদিকে গোল টেবিল বিছানো। প্রতিটি টেবিলে চারজন অনায়াসে বসতে পারে। প্রদর্শনীর কারণে ক্যান্টিনে আজ লোক সমাগম অনেক। তাদের তিন জোড়া চোখ শোরগোল মুক্ত নির্জন স্থানের সন্ধান করছিল। মিহা ক্যান্টিনের বাম কোণে খানিকটা কোলাহলমুক্ত একটি শূণ্য টেবিল দেখতে পেলো। যা খানিকটা নিরিবিলি ও কোলাহল মুক্ত ছিল। তারা তিনজন গিয়ে সেখানে বসল। সারা তার পার্স থেকে কিতাবটি বের করল এবং পনেরো নম্বর অধ্যায় খুলে উঁচু আওয়াজে পড়তে লাগল। চেহারার পর্দার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসের দলিলসমূহ–

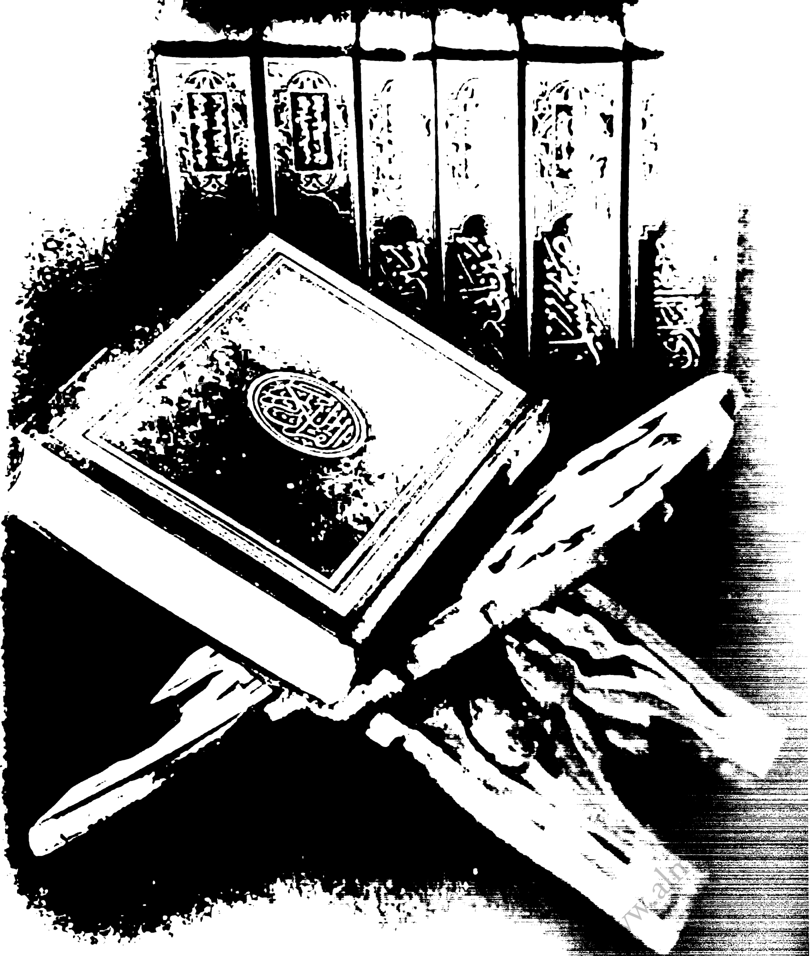
প্রথম দলিল

পর্দা সম্পর্কীত আয়াত। যেখানে নারীদেরকে বড় চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে নেয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٥٩

'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে।

চেহারার পর্দার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসের দলিলসমূহ



ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৯)*

এই আয়াতে সকল নারীদের কথাই উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূন্যাত্মা স্ত্রীগণসহ অন্যান্য মুসলিম নারীগণও এ হুকুমের আওতাভূক্ত। এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলিম নারীদের জন্য চেহারার পর্দা করা জরুরী। আরো আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য পরপুরুষ থেকে আড়াল রাখে। আলোচ্য আয়াত থেকে মহিলা সাহাবীগণও এ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন যে, জালবাব তথা বড় চাদর দ্বারা পুরো শরীর ঢাকার পাশাপাশি চেহারাও আবৃত রাখতে হবে।
সেমতে ইমাম আবু দাউদ রহ. হযরত উম্মে সালমা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আনসারী নারীরা কালো চাদর পরিধান করে ঘর থেকে বের হতো। *(সূনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪১০১)*

দ্বিতীয় দলিল



ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি আনসারী নারীদের থেকে উত্তম আর কোনো নারী দেখিনি। কিতাবুল্লাহর সত্যায়ন ও তার উপর ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে অগ্রগামীও কাউকে দেখিনি। সূরা নূরে পর্দা সংক্রান্ত আয়াত তথা –

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...

'তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

পুরুষেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা শুনে ঘরে গিয়ে নিজেদের স্ত্রী-কন্যা ও মা,

বোনদেরকে শোনালো। নারীদের প্রত্যেকেই তখন আল্লাহর সেই বিধান পালনে সচেষ্ট হলো। তারা বড় চাদরে তাদের মাথা আবৃত করল। কতেক নারী তাদের তাহমদকে ছিড়ে উড়না বানিয়ে নিলো। সকালে যখন নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসল তখন তাদের মাথা চাদরে ঢাকা ছিল। আর তারা এতটাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন তাদের মাথায় কাক বসে আছে। *(তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম : ৮/২৫৭৫ এবং সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪১০০)*

তৃতীয় দলিল

উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নারীদেরকেও ঈদের নামাযে আসার আদেশ দিলেন, তখন তাঁর কাছে আরজ করা হলো,

হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোনো নারীর কাছে বড় চাদর না থাকে, তাহলে? তিনি বললেন,

لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

অর্থাৎ, সে যেন তার বোনের চাদরের কিছু অংশ জড়িয়ে নেয়। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-৩৫১)*

এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, নারীরা নিজেদেরকে পর্দাবৃত না করে পরপুরুষের সামনে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

চতুর্থ দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।' *(সূরা নূর, আয়াত : ৩০)*

নারীরা তাদের চেহারা পর্দামুক্ত রাখার অর্থই হলো তারা যেন পুরুষদেরকে তাদেরকে দেখার প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আর একজন বিবেকবান মানুষের পক্ষে এটা বুঝতে কোনো কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে'। *(সূরা নূর, আয়াত ৩১)*

অর্থাৎ, নারীদের জন্য তাদের রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা উচিত, কেননা তা পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখতে সাহায্য করবে।

পঞ্চম দলিল

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

'তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে'। *(সূরা নূর, আয়াত : ৩১)*

অর্থাৎ, নারীদের জন্য পায়েল বা নুপুর পরে ঘর থেকে বের হওয়া হারাম। কারণ, পায়েল, নুপুরের রিনিঝিনি শব্দ পুরুষের মনে ফেতনার উদ্রেক ঘটাতে পারে। নারীদের জন্য যেহেতু এতটুকুর বৈধতাও নেই, তাহলে চেহারা খোলা রাখা জায়েয হবে কিভাবে?

আচ্ছা, পায়েলের রিনিঝিনি শব্দে যদি পুরুষের মনে ফেতনার উদ্রেক হতে পারে তবে কি নারীর মোহনীয় রূপ-মাধুরী তাকে উম্মাদ করে তুলবে না?

ষষ্ঠ দলিল

অতিশয় বৃদ্ধা নারীদের ক্ষেত্রে পর্দা না করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রোখসত রেখেছেন। অতিশয় বৃদ্ধা নারীদের যৌবন ও কামপ্রবৃত্তির অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তারা যদি পর্দা অবলম্বন করে তবে সেটা তাদের জন্য খুবই উত্তম।

ইরশাদ করেছেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

'বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তবে তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। *(সূরা নূর, আয়াত : ৬০)*

সপ্তম দলিল

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

'তোমরা তার পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ'। *(সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৩)*

চেহারার পর্দার আবশ্যিকতার ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট দলিল। বর্ণিত এ বিধানটিতে বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূণ্যাত্মা স্ত্রীগণের নিকট (এবং তোমাদের স্ত্রী ব্যতিত অন্য কোনো নারীর নিকট) কোনো কিছু নেয়ার প্রয়োজন হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। পর্দার এ বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা এবং শয়তানের প্ররোচণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

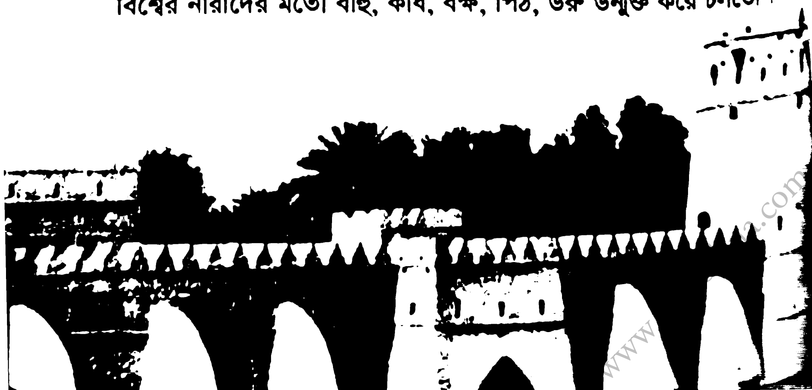
অষ্টম দলিল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى ... تَطْهِيْرًا ۞ ٣٣

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে'। *(সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৩)*

আলোচ্য আয়াতে মুসলিম নারীদেরকে ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রাচীনকালের আরব-পুরুষেরা অতিশয় আত্মমর্যাদাশীল ছিল। তাদের নারীদের দিকে কেউ লালসার চোখে তাকালে কিংবা তাদেরকে নিয়ে কোনোরূপ উপহাস করলে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যেতো। তুমি কি ভাবছ? জাহেলী যুগের নারীরা অধুনা বিশ্বের নারীদের মতো বাহু, কাঁধ, বক্ষ, পিঠ, উরু উন্মুক্ত করে চলতো।



না। তারা কেবল চেহারা খোলা রাখত কিংবা বড়জোর তাদের চুল নজরে পড়তো। তদুপরি অজ্ঞতার যুগের অধিকাংশ নারীরাই চেহারা পর্দাবৃত রাখত। সেকালের কাব্য সাহিত্য থেকে এমনটিই জানা যায়। তদুপরি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

'অজ্ঞতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না'। (প্রাগুক্ত)

নবম দলিল

হজ ও ওমরা আদায়কালে নারীদেরকে তাদের চেহারা খোলা রাখতে হয়– একথা সবারই জানা। এ ব্যাপারে মহিলা সাহাবীদের আমল এমন ছিল যে, হজ ও ওমরার সময় তারা যখন তাবুর ভেতরে থাকতেন তখন চেহারা খোলা রাখতেন। কিন্তু যখনই কোনো অচেনা মুসাফির তাদের পাশ দিয়ে যেত, হযরত আয়েশা রা. এর বক্তব্য মতে– তখন তারা মাথা থেকে চাদর টেনে মুখ ঢেকে ফেলতেন। মুসাফির চলে যাওয়ার পর তারা চেহারা থেকে পর্দা সরাতেন। *(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-১৮৩৩)*

এহরাম অবস্থায় কৃত তাদের এই আমল থেকে পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখার আবশ্যিকতার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

দশম দলিল

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা পরপুরুষের সামনে নিজেদের চেহারা ঢেকে রাখতাম। *(আল-মুসতাদরিক লিল হাকিম, ১/৪৫৪)*



একাদশ দলিল

ইফকের ঘটনা : ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশা রাযি. এর উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা রাযি. প্রথমে উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। এটাই ছিলো নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। হযরত আয়েশা রাযি. এর টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে হারিয়ে গেলো। তিনি সেখানে তার হার খুঁজতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো।

স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা চলে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা রাযি. এর পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকেরা ভেবেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূণ্য– এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা রাযি. ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয়



দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-সেদিক খোঁজ করার পরিবর্তে গায়ে চাদর জড়িয়ে স্বস্থানে বসে রইলেন। সময় তখন শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। অপরদিকে সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি ভোর বেলায় এখানে এসে পৌছলেন। প্রভাতের আলো তখন পুরোপুরি উজ্জ্বল হয়নি। তিনি শুধু একজন মানুষকে ঘুমন্ত দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশা রাযি. কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর নেহায়েত বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। বাক্যটি হযরত আয়েশা রাযি.-এর কানে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি জেগে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রাযি. তাতে সওয়ার হলেন এবং সফওয়ান উটের নাকের রশি ধরে কাফেলার তালাশে দ্রুতপদে হেঁটে চলতে লাগলেন। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং- ৪১৪১)*

দ্বাদশ দলিল

হযরত আয়েশা রাযি. এরই বর্ণনা, তিনি বলেন- মুসলিম নারীরা নিজেদেরকে বড় চাদরে ঢেকে ফজরের নামাযে উপস্থিত হতো। নামায পড়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় আঁধারের কারণে কেউ তাদেরকে চিনতে পারত না। ***(বুখারী শরিফ, হাদিস নং- ৫৭৮ এবং মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৬৪৫)***



ত্রয়োদশ দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে কেউ অহংকার বশত তার কাপড় কে মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দিকে তাকবেন না। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং- ৫৭৮৪ এবং মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-২০৮৫)*

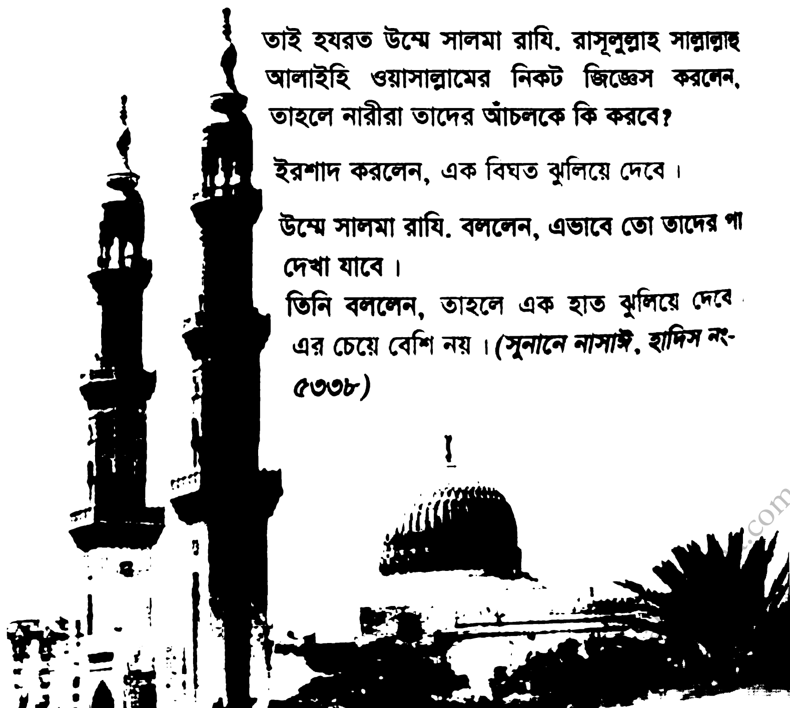
অর্থাৎ, টাখনুর নিচে বস্ত্র পরিধান করা জায়েয নেই। উম্মুল মুমেনিন হযরত সালমা রাযি. এই হাদিস শোনার পর ভাবলেন যে, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা বোধহয় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই হারাম। তদানিন্তন নারীরা পা ঢাকার জন্য নিজেদের বস্ত্রকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিতো। দারিদ্রের কারণে অধিকাংশ নারীরাই মোজা পরিধাণের সামর্থ্য রাখত না।

তাই হযরত উম্মে সালমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে নারীরা তাদের আঁচলকে কি করবে?

ইরশাদ করলেন, এক বিঘত ঝুলিয়ে দেবে।

উম্মে সালমা রাযি. বললেন, এভাবে তো তাদের পা দেখা যাবে।

তিনি বললেন, তাহলে এক হাত ঝুলিয়ে দেবে এর চেয়ে বেশি নয়। *(সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং-৫৩৩৮)*



সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নারীদের পায়ের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে চেহারা প্রদর্শনের বৈধতার কথা কল্পনা করা যায় কিভাবে?

চতুর্দশ দলিল

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

'ইহরাম অবস্থায় নারীগণ নেকাব বা উড়না পরিধান করবে না।' *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-১৮৩৮)*

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগের নারীরা সাধারণত নেকাব বা উড়না পরিধান করতো। এজন্যে ইহরাম অবস্থায় তা বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

পঞ্চদশ দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

নারীরা নারীদের সাথে (এক কাপড়ে) শরীরের সাথে শরীর মিলিয়ে শোবে না। কারণ, সে স্বামীর কাছে গিয়ে তার গঠন-আকৃতির বিবরণ এভাবে দেবে যে, যেন সে তাকে দেখছে। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-৫২৪০)*

এই হাদিস প্রমাণ বহন করে যে, নবী-যুগের নারীরা চেহারা ঢেকে ঘর থেকে বের হতো। সে কারণেই পুরুষের জন্য অন্য নারীর চেহারার বিবরণ জানতে তার স্ত্রীর সাহায্য নিতে হতো।

ষষ্টদশ দলিল

হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি এক নারীকে বিবাহের পয়গাম পাঠালাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে সম্পর্কে বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন–

তুমি কি তাকে দেখেছ?

আমি বললাম, না।

তিনি বললেন, তাকে দেখে আসো। তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

আমি দেখতে গেলাম। তার বাবা-মা দুজনেই ছিলেন। আর মেয়েটি ছিল পর্দার অন্তরালে।

আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাকে দেখার আদেশ দিয়েছেন।

তারা দুজন নিশ্চুপ রইলেন। পর্দার আড়াল থেকে মেয়েটি বলল– আমি আপনাকে কসম দিচ্ছি। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি অবশ্যই দেখবেন। আর যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন না।'

অতঃপর আমি তাকে দেখলাম। তাকে বিবাহ করলাম। আমার মনে এই মেয়েটির জন্য যতটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল, অন্য কোনো নারীর জন্য তা ছিল না। *(কানযুল উম্মাল, হাদিস নং-৪৫৬১৯ এবং সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, ১/১৭১)*



সেকালের নারীরা যদি মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করত, তাহলে তাকে দেখার ব্যাপারে হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাযি. এর এতটা দ্বিধাগ্রস্থ হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না।

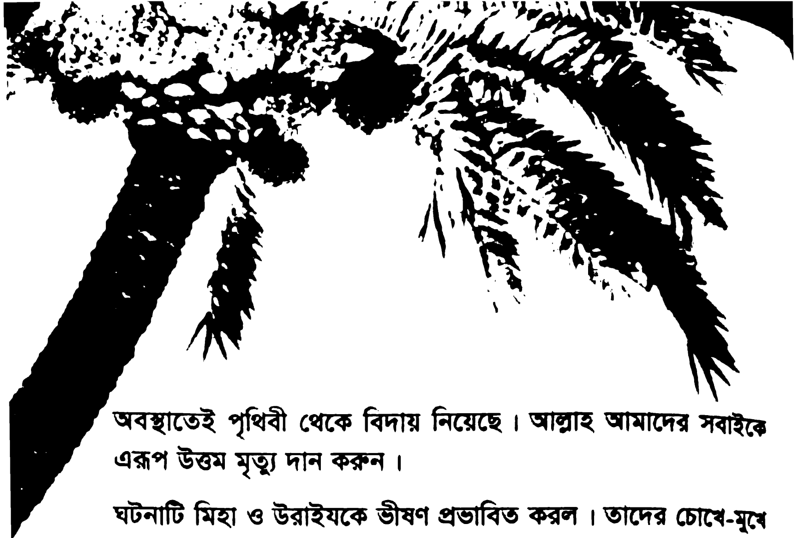
এ পর্যন্ত পড়ার পর সারা কিতাব থেকে মাথা তুলল। উরাইয মিহার দিকে তাকিয়ে দেখল তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। মিহা তুমি কাঁদছ কেন?

না, না কিছু না। চোখ মুছতে মুছতে বলল মিহা। আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করুন। নারী সাহাবীগণ কেমন আল্লাহভীরু ছিলেন। সাহাবীকে শপথ দিচ্ছেন– আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিলেই সে তার চেহারা দেখাবে নয়তো নয়। অথচ আমি ঝলমলে পোষাক পরে পথে-ঘাটে, বাজারে, হাসপাতালে ঘোরাফেরা করছি। সেই নারী সাহাবীটি তার জন্য বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসা একজন সৎ, পরহেযগার সাহাবীর সামনে একবার খোলা চেহারায় আসতে কতো সংকোচ করেছে। অথচ আমি চেহারা অনাবৃত রেখে, নকশি বোরকা গায়ে জড়িয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি আর পুরুষের কুদৃষ্টির শিকার হচ্ছি। এতটুকু বলার পর মিহা আবার চোখ মুছল।

মিহাকে কাঁদতে দেখে এবং আলোচনায় প্রভাবিত হতে দেখে সারা শুকরিয়া আদায় করল। এবং বলল, মিহা, এখন থেকে তুমি পরিপূর্ণ শরঈ পর্দা অবলম্বন করে চলো। আল্লাহ তোমাকে উত্তমরূপে কবুল করুন। একটা সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি-

এক সতী-সাধ্বী, পুণ্যাত্মা নারী ছিল। পঞ্চাশ বছর ধরে সে বাকশক্তিহীনা– বোবা। তার দিন কাটতো রোজা রেখে আর রাত নামাজে দাঁড়িয়ে। বোবা হওয়াতে তার রাতের নামাজ আদায়ের কোনো শব্দ স্বামীর কানে আসত না।

এক রাতের কথা। তার স্বামী ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। সে শুনতে পেল তার বোবা স্ত্রী সশব্দে, সঠিক উচ্চারণে নামায আদায় করছে। সে যারপর নাই অবাক হলো এবং আনন্দে তার দুচোখে অশ্রু নেমে এল। সে কানপেতে শুনল স্ত্রী তার প্রভুর নাম জপছে। প্রাথর্ণায় কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সবশেষে সে দেখল তার স্ত্রী সুস্পষ্টস্বরে কালেমা পড়তে পড়তে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছে এবং সে



অবস্থাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এরূপ উত্তম মৃত্যু দান করুন।

ঘটনাটি মিহা ও উরাইযকে ভীষণ প্রভাবিত করল। তাদের চোখে-মুখে সারা সেই ছাপ দেখতে পেল। অতঃপর উরাইয বলল। আচ্ছা, এবার সামনে পড় সারা।

সারা পুনরায় পড়া শুরু করল।

সপ্তদশ দলিল

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ

তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ কোনো নারীকে বিবাহের পয়গাম পাঠাও, তখন সম্ভব হলে তার অবাক করা সৌন্দর্যের কিছু দেখে নাও, যা সেই নারীকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। (যদি সম্ভব হয়)।

হযরত জাবের রাযি. বলেন, আমি বনি সালামার এক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালাম। খেজুর গাছের পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তাকে দেখতাম। পরিশেষে আমি তাকে বিবাহ করতে আগ্রহী হলাম এবং তাকে বিবাহ করলাম। *(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-২০৮২)*

ভেবে দেখার বিষয় হলো, সেকালের নারীরা যদি চেহারা খোলা রেখে

চলাফেরা করতো, তাহলে হযরত জাবের রাযি. তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়ত না।

অষ্টদশ দলিল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য শেষ করে ফিরছিলাম। মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক নারীকে দেখতে পেলাম। আমরা ভাবতে পারিনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চিনে ফেলবেন। কিন্তু তিনি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা! কোথা থেকে এসেছ? হযরত ফাতেমা রাযি. বললেন, আমি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে এসেছি। আমি মৃতের জন্য দোআ ও তা'জিয়া (শোক প্রকাশ) করেছি। *(আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম, ১/৩৭৪)*

সাহাবায়ে কেরাম ভেবেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে চিনতে পারেননি।

কারণ, তিনি পরিপূর্ণ পর্দাবৃতা ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চালচলন দেখে নিজ মেয়েকে চিনে ফেলেছিলেন।

হযরত ফাতেমা রাযি. যদি চেহারা খোলা রাখতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চেনা না চেনার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম দ্বিধাগ্রস্থ হতেন না।

দলিল নং ১৯

ইমাম মুসলিম রহ. তার কিতাব সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا (يعني صغرا)..

তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাল যে, সে আনসারের এক মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে দেখেছ?

সে বলল, না।

তিনি বললেন, যাও তাকে দেখে নাও। কারণ, আনসারদের চোখে কিছু (ক্ষুদ্রতা) থাকে। (মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-১৪২৪)

এবার উরাইয মুখ খুলল, সম্ভবত তিনি তাকে চেহারা ও দুহাতের তালু ব্যতিত অন্য কিছু দেখতে বলেছেন।

সারা বলল, না। তোমার ধারণা ঠিক নয়। কারণ তিনি তাকে পাত্রির চোখ দেখে নিতে বলেছেন। আর চোখ তো চেহারাতেই থাকে, তাই না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চেহারা দেখার কথাই বলেছেন।

দলিল নং ২০

এটি যৌক্তিক দলিল। একজন নিরপেক্ষ বিবেকবান মানুষ মাত্রই একথা স্বীকার করবে যে, শরিয়ত পরপুরুষের সামনে কোনো নারীকে চেহারা খোলার অনুমতি দিতে পারে না। কারণ, চেহারাই সৌন্দর্য-শোভার আসল কেন্দ্র এবং রূপ-মাধুরীর প্রকাশস্থল। বিশেষকরে নারী সুন্দরী হলে এবং তার আকর্ষণীয় চেহারার দিকে পুরুষের চোখ পড়লে পুরুষের কামভাব জেগে ওঠা এবং ফেতনা-ফাসাদের প্রাদুর্ভাব ঘটা অবশ্যম্ভাবী।



উচ্চস্বরে বিশ নং দলিলটি পড়ার পর সারা কিতাব থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে বলল, লেখক এ সংক্রান্ত যেসব প্রমাণ পেশ করেছেন, তা শেষ হয়ে গেছে। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, আমরা নারীদেরকে পুরুষের ফেতনা থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের হাত, পা, কান, কাঁধ ঢেকে রাখতে বলি। অথচ সেই আমরাই আবার ফতোয়া দিই যে, মনোহরী মেকাপে রাঙানো চেহারাখানা খুলে রাখো। ভাবটা এমন যে, নারীদের চরণই যেন পুরুষের হৃদয় হরণ করে নেবে। তারা কঠিন ফেতনার শিকার হবে। আর নারীর সুশোভিত ওষ্ঠযুগল, কমনীয় কপোল ও মোহনীয় নয়ন দেখে পুরুষের কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠবে না।

উরাইয বলল, এটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাই বা কম কিসে। যদিও আমি মেকাপ নেই না। তবু বোরকা পরে, চেহারা খোলা রেখে যখন রাস্তায় বেরুই, তখন পুরুষের দৃষ্টির বৃষ্টিতে সিক্ত হতেই হয়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। উরাইয ঠিকই বলেছে। আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিন। মাথা দোলাতে দোলাতে বলল মিহা।

মিহার কথা শুনে উরাইয রেগে গেল। দৃষ্টিকে কঠোর করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দিন! একবার আয়নায় নিজের মুখখানা দেখো দেখি।

না, উরাইয! আসলে আমি এটা বোঝাতে চাইনি। মিহার কণ্ঠে বিনয়।

মুহূর্তেই দু' বোনের খুনসুটি প্রায় ঝগড়ায় রূপ নিচ্ছিল। কিন্তু মাঝখানে সারা এসে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। সে বলল, আচ্ছা, এবার তোমরা থামো। চলো, আমি তোমাদেরকে পর্দা সম্পর্কে আমাদের চার ইমাম (আবু হানিফা, মালেক, শাফেঈ এবং আহমদ রহ.)-এর বক্তব্য পড়ে শোনাচ্ছি। এর দ্বারা যে সকল মুফতিরা বলে যে, চার ইমামের মতেও নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয আছে- তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

চমৎকার। জলদি পড়ে শোনাও। উরাইয সারাকে তাড়া দিল।

মুখমণ্ডলের পর্দার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত্য



সারা পড়া শুরু করল– মুখমণ্ডলের পর্দার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত্য।

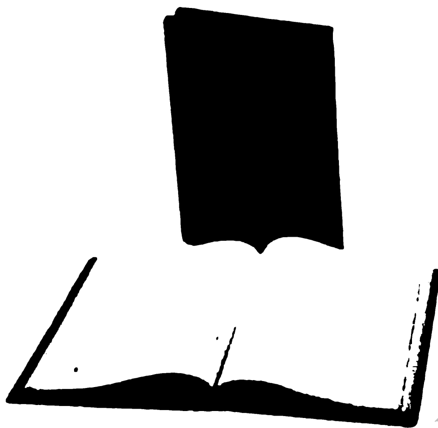
হানাফী ওলামায়ে কেরামের অভিমত

হানাফী ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয নেই। কারণ, নারীদের উন্মুক্ত মুখমণ্ডল থেকেই ফেতনার আবির্ভাব ঘটে। তারা বলেন, সমস্ত মুসলমানেরা এ বিষয়ে একমত যে, নারীদের জন্য মুখ খোলা রেখে ঘরের বাইরে বের হওয়া বৈধ নয়।

ফুকাহায়ে আহনাফের কয়েকটি অভিমত নিম্নরূপ :

ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. বলেন– যুবতী নারীদের ব্যাপারে বিধান হলো, তারা পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখবে এবং ঘর থেকে বের হতে হলে পূর্ণ পর্দার সাথে বের হবে। যেন দুষ্ট লোকের কুদৃষ্টি তাদের ওপর না পড়ে। *(আহকামুল কোরআন, ৩/৪৫৮)*

শামছুল আয়িম্মাহ সারাখসী রহ. বলেন– বেগানা নারীদের দেখা হারাম হওয়ার কারণ হলো, তাদেরকে দেখলে পুরুষের মনে ফেতনার উদ্রেক হয়। চেহারা ও তার রূপ-লাবণ্য দেখা দেহের অপরাপর অঙ্গ দেখা থেকে অধিকতর ফেতনার কারণ হয়ে থাকে। *(আল মাবসূত, ১০/১৫২)*

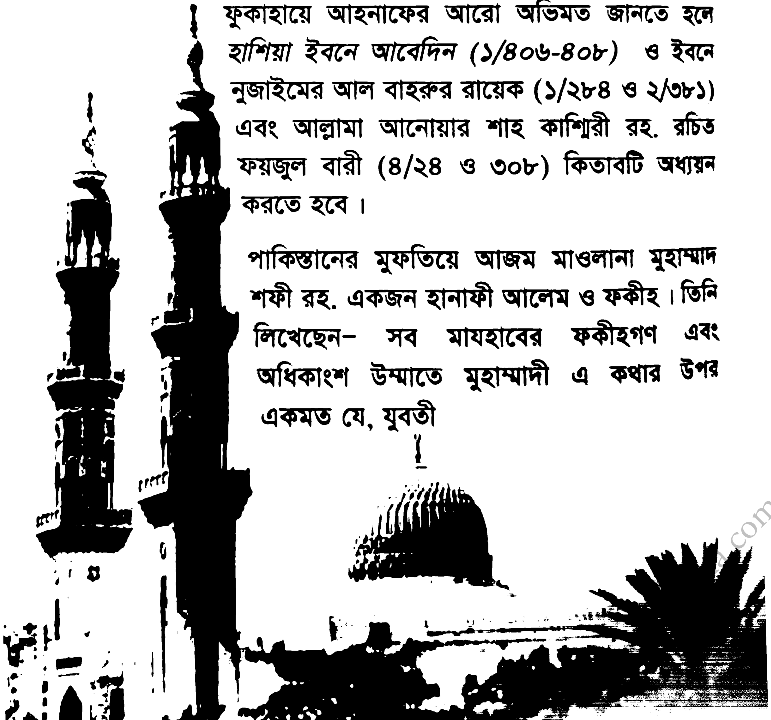


ইমাম আলাউদ্দিন রহ.-এর অভিমত হলো– যুবতী নারীদের মুখাবয়ব অনাবৃত রেখে পরপুরুষের সামনে যেতে নিষেধ করা হবে।

ইবনে আবিদীন রহ. এই অভিমতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–নারীদের জন্য খোলা মুখে পরপুরুষের সামনে যেতে বারণ করার কারণ হলো, পুরুষেরা তাদের দিকে কামনার চোখে তাকাতে পারে, পরিণামে যা মহা ফেতনার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। *(হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিন, ২/৪৮৮)*

ওলামায়ে আহনাফ থেকে এই অভিমতও পাওয়া যায় যে, এহরামাবস্থায় কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ সামনে এসে গেলে নারীদের জন্য চেহারার পর্দা করা ফরজ। *(হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিন, ২/৫২৮)*

ইমাম তাহাবী রহ. বলেন– যুবতী নারীরা পরপুরুষের সামনে খোলা মুখে যেতে পারবে না। *(রদ্দুল মুখতার, ১/২৭২)*



ফুকাহায়ে আহনাফের আরো অভিমত জানতে হলে *হাশিয়া ইবনে আবেদিন (১/৪০৬-৪০৮)* ও ইবনে নুজাইমের আল বাহরুর রায়েক (১/২৮৪ ও ২/৩৮১) এবং আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. রচিত ফয়জুল বারী (৪/২৪ ও ৩০৮) কিতাবটি অধ্যয়ন করতে হবে।

পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী রহ. একজন হানাফী আলেম ও ফকীহ। তিনি লিখেছেন– সব মাযহাবের ফকীহগণ এবং অধিকাংশ উম্মাতে মুহাম্মাদী এ কথার উপর একমত যে, যুবতী

নারীরা পরপুরুষের সামনে চেহারা ও হস্তদ্বয় অবমুক্ত রেখে গমন করা জায়েয নেই। তবে বৃদ্ধা নারীগণ এ হুকুমের আওতাভূক্ত নন। *(আল-মারআতুল মুসলিমাহ, পৃষ্ঠা : ২০২)*

এতটুকু পড়ার পর সারা একটু থেমে বলল, হানাফী ওলামায়ে কেরামের একটা উক্তি আমার মধ্যে ভীষণ দাগ কেটেছে। সেটা হলো– নারীরা বেপর্দা হয়ে চেহারা খোলা রেখে চলাফেরা করলে ইতর প্রকৃতির পুরুষদের কুদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে না। একথার ওপর আমার এক মহিলার ঘটনা মনে পড়ে গেল। মহিলার স্বামীকে জীবিকার তাগিদে অন্য শহরে পাড়ি জমাতে হয়েছিল। তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে একটা ফ্ল্যাটে রেখে যাবার সময় তার বড় ভাইকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেল।

মহিলাটি বলেন- প্রায় প্রতিদিনই বড় ভাই আমাদের ফ্ল্যাটে আসত। আমি তাকে আমার ঘরেরই একজন সদস্য মনে করতাম এবং তার সামনে পর্দা করতাম না। প্রথম প্রথম তার আচার-আচরণ স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি বিভিন্ন বাহানায় বারবার আমাদের ফ্ল্যাটে আসতে শুরু করল। আমার কাছে আমার ছোট ছোট বাচ্চারা ছাড়া অন্য কোনো মাহরাম পুরুষ ছিল না। সহসা বড় ভাইয়ের আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন অনুভব করলাম। তিনি মাত্রাতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলেন।

আমার স্বামী ছুটিতে বাড়ী এলো। আমি দাম্পত্য কলহের ভয়ে তার কাছে এ ব্যাপারে কিছুই বললাম না। ছুটি শেষে তিনি তার চাকুরীতে ফিরে গেল। তিনি চলে যাবার পরই বড় ভাই আবার আগের মতো আচরণ শুরু করল।



আমি আমার স্বামীর কাছে কিছুই বলিনি বলে সে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠল। এমনকি মাঝে মাঝে দুষ্টুমীর বাহানায় আমার শরীরে স্পর্শ করতে লাগল। যখন তখন হুট করে ঘরে চলে আসত। তার জ্বালায় প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত প্রায়। একদিন বসে বসে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় এলো আমি যদি বড় ভাই ও অপরাপর পরপুরুষদের সাথে পর্দা করা শুরু করি তাহলে কেমন হয়? আমি স্বামীর কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলাম। তিনি সম্মতি জানিয়ে প্রতিউত্তর পাঠালেন। আমি হিজাব পরা শুরু করলাম। পরের দিন বড় ভাই সাহেব যথারীতি ঘরে এসে আমাকে পর্দাবৃত দেখে চমকে ওঠলেন। দূরে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলেন, আরে, এসব কি?

আমি বললাম, আমি আর পরপুরুষের সামনে চেহারা দেখাব না। আমার সাথে কোনো কথা বলতে হলে দয়া করে পর্দার আড়াল থেকেই বলবেন।

বড় ভাই মাথা নিচু করে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে নিরবে চলে গেলেন। এভাবেই পর্দার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে সম্ভাব্য এক বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

সুবহানাল্লাহ! উরাইয বলল, আল্লাহ তাআলা তো সত্যিই বলেছেন–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

'তোমরা তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ'। (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৩)

সারা পুনরায় পড়া শুরু করল....

মালেকী ওলামায়ে কেরামের অভিমত

মালেকী মাযহাবের ফকীহদের মতে নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা জায়েয নেই। কারণ, খোলা চেহারাই ফেতনা-ফাসাদের সুতিকাগার। এ জন্যেই মালেকি মাযহাব মতে মুখমণ্ডল অনাচ্ছাদিত রেখে যে নারী ঘরের বাইরে বেরুতে চায় তাকে বাঁধা দেওয়া জায়েয আছে।

মালেকী মাযহাবের অন্যতম দুজন ফকীহ–কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী এবং ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, কেবল অতিশয় প্রয়োজনের সময়ই নারীদের জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়েয আছে। আর সেই অতিশয় প্রয়োজনটি এরূপ হতে পারে যে, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে চেহারা খুলে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে কিংবা অসুস্থতার কারণে ডাক্তারের সামনে মুখাবয়ব খুলতে হবে। *(আহকামুল কোরআন, ৩/১৫৭৮)*

মালেকী মাযহাবের সম্মানিত ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত্যে পৌছেছে যে, নারীদের জন্য চেহারার পর্দা ওয়াজিব।

মালেকী মাযহাবের আরেক ইমাম বলেন, ইবনে মারযুক অত্যন্ত সুস্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, মালেকী মাযহাবের প্রশিদ্ধ অভিমত হলো- ফেতনার আশংকা থাকলে নারীদের জন্য তাদের চেহারা ও হাত ঢেকে রাখা জরুরী। *(জাওয়াহিরুল আকলিল : ১/৪১)*



এই মাসআলা সম্পর্কিত মালেকী মাযহাবের ওলামায়ে কেরামের আরো অভিমত জানতে হলে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে-

আল মিয়ারুল মারাব (২২৯ এবং ১১/২২৬ এবং ১০/১৬৫), হাত্তাব রচিত মাওয়াহিবুল জালিল (৩/১৪১), আদ দাখিরাতুল কারাফি (৩/৩০৭), মুবারক রচিত আত তাসহিল ৩/৯৩২), হাশিয়াতুদ দুসুকি আলাল শরহিল কাবির (২/৫৫), কালামু মুহাম্মদ আল কাফি আত তিউনিসি কামা ফিস সারিমিল মাসহুর (পৃ. ১০৩) এবং আবি রচিত জাওয়াহিরুল ইকলিল (১/১৮৬)

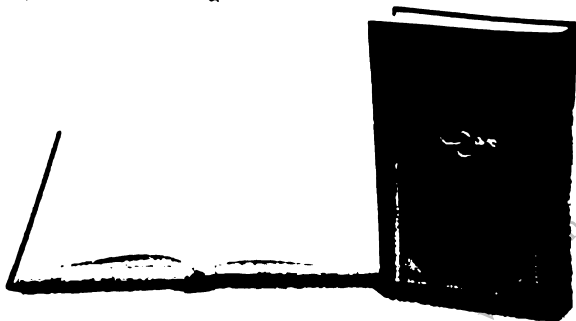
শাফেয়ী ওলামায়ে কেরামের অভিমত

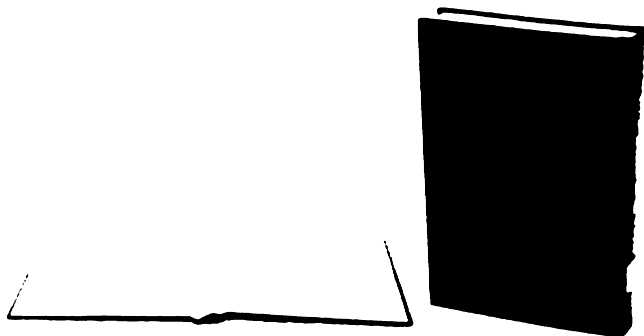
শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত হলো- ফেতনার আশংকা থাকুক বা না থাকুক নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা জায়েয নেই।

শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী বলেন, নারীদের জন্য চেহারা খোলা রেখে ঘরের বাইরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানদের মতৈক্য রয়েছে। কারণ, দৃষ্টিই ফেতনার প্রধান উৎস। *(রওজাতুত তালিবিন ৭/২৪)*

ইবনে রাসলান আশ-শাফেয়ী বলেন- মুসলিম নারীদেরকে মুখ খোলা রেখে বাইরে বেরুতে নিষেধ করা হবে, বিশেষ করে যখন সমাজে অসৎ লোকের আধিক্য থাকে। *(আউনুল মাবুদ : ১১/১৬২)*

শাফেয়ী মাযহাবেরই আরেক ইমাম হযরত মাওযেঈ বলেন- আবহমান কাল ধরে মুসলিম সমাজের চলে আসা রীতি হলো,





তারা বৃদ্ধা নারীদেরকে চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দিয়ে থাকে। কিন্তু যুবতী নারীদেরকে এরূপ করতে দেয় না। তারা এটাকে ভালো মনে করে না। সম্ভবত কোনো নারীর জন্যেই অপ্রয়োজনে চেহারা খোলা রাখার বৈধতা নেই এবং কোনো যুবকের জন্যেও তার দিকে তাকানো দুরস্ত রাখা হয়নি। *(তাইসিরুল বয়ান লি আহকামিল কুরআন : ২/১০০১)*

ফুকাহায়ে শাফেয়ীর অন্যান্য অভিমত সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দ্রষ্টব্য–

এহইয়াউ উলুমুদ্দিন (২/৪৯), রওজাতুত তালিবিন (৭/২৪), হাশিয়াতুল জামাল আলা শরহিল মানহাজ (১/৪১১), হাশিয়াতুল কালয়ুউবি আলাল মিনহাজ (১/১৭৭), জারদানির ফাতহুল আলাম (২/১৭৮), বাগাভির শরহুস সুন্নাহ (৭/২৪০)

হাম্বলী ওলামায়ে কেরামের অভিমত

হাম্বলী ওলামায়ে কেরামের অভিমতও অনুরূপ যে, নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. এর অভিমত হলো, নারীরা ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের শরীরের কোন অংশই যেন পরিদৃষ্ট না হয়।
(আল ফুরু : ১/৬০১)

ফলাফল

ইসলাম ধর্মের অধিকাংশ আলেমদের বক্তব্য হলো– নারীদের জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা অনাবৃত রাখা জায়েয নেই। এ মাসআলার ব্যাপারে যে সকল ইমামগণ ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন, তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

ইবনে আবদুল বার রহ. যাকে পাশ্চাত্যের মালেকী মাযহাবের অন্যতম আলেম হিসেবে গণ্য করা হয়– তিনি বলেছেন, ফেতনা-ফাসাদের যুগে নারীদের জন্য চেহারার পর্দা করা ওয়াজিব।

আর এ ব্যাপারে মুসলিম আলেমদের ঐক্যমত্যও রয়েছে।

শাফেয়ী মাযহাবের প্রাচ্যের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ইমাম নববী রহ.ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অভিমতও অভিন্ন।

হানাফী মাযহাবের খলীল আহমদ সাহারানপুরী এবং মুফতী শফী রহ.ও এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত্যের কথা লিখেছেন।

এখন বলো, যারা বলে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত চেহারা খোলা রাখার পক্ষে–তাদের বিরুদ্ধে পেশ করার মতো আর কি দলিল বাকী আছে?



ইমামদের অভিমতগুলো খুবই তাৎপূর্ণ ছিল। মিহা তো বারবার নিজের বোরকার দিকে তাকাচ্ছিল আর কি যেন ভাবছিল। মনে হচ্ছে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু উরাইযকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখনো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

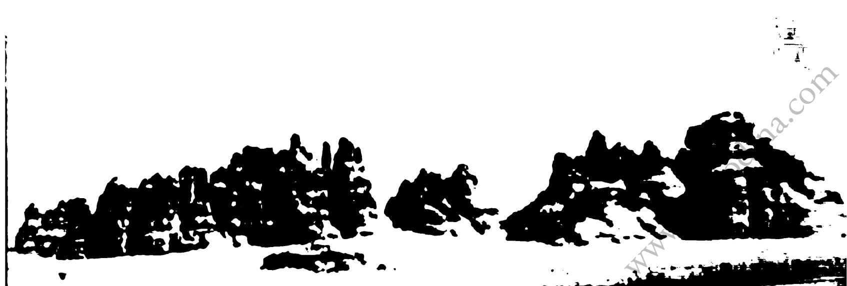
সে সারার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখো সারা! তোমার সাথে একমত হতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু আমার মনে দুটি কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, যেগুলো নিয়ে আমার অধ্যয়নও নেহায়েত কম নয়।

আচ্ছা। তো সেই দুটি কথা কি? প্রশ্ন সারার।

উরাইয বলল, প্রথম কথা হলো আজকাল চেহারার পর্দার কথা কেবল সৌদি আলেমরাই বলে থাকেন। আর দ্বিতীয় কথা হলো, চেহারার পর্দার ব্যাপারটি হলো একটি চলে আসা রীতি ও অনুবর্তনীয় বিষয়। ধর্মীয় বিধানাবলির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তুমি যেসব দলিল পেশ করেছ তা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং চেহারা ঢেকে রাখার আবশ্যিকতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কিন্তু সৌদি মাশায়েখ ব্যতিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ওলামাগণ কি মুখমণ্ডলের ঢেকে রাখার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন?

উরাইযের কথায় সারা মৃদু হেসে বলল, এই কিতাবের আরেকটি অধ্যায়ে তোমার এ প্রশ্নের সুন্দর জবাব রয়েছে। আমি তোমাকে সে অধ্যায়টি পাঠ করে শোনাচ্ছি।



…ারার পর্দার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের আলেমগণের অভিমত



আল্লামা আমীর সানআনী (ইয়ামেন)

আল্লামা আমীর সানআনী তার লিখিত –
" الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية " নামক কিতাবে নারীদের চেহারা খোলা রাখার পক্ষে মত দানকারী আলেমদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (পাকিস্তান)

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী পর্দা বিষয়ক একটি কিতাব লিখেছেন। যেখানে তিনি পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পর্দার আয়াতের বিশ্লেষণে লিখেছেন– যদি কেউ এ আয়াতের শব্দাবলি, প্রত্যেক যুগের মুফাচ্ছিরীনদের ব্যাখ্যা এবং নবী-যুগের মানুষদের আমল নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে, তাহলে সে নির্দ্বিধায় একথা মেনে নেবে যে, ইসলামী শরিয়ত পরপুরুষের সামনে নারীদের চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে উম্মতের কর্মধারাও অনুরূপ।



শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী (সিরিয়া)

শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী তার "روائع البيان في تفسير ايات الأحكام من القرآن" নামক তাফসীর গ্রন্থে " ايات الحجاب والنظر " শীর্ষক একটি অধ্যায়ের শেষাংশে তিনি লিখেছেন, নারীদের চেহারা খোলা রাখার কু-প্রথাটি আজকাল হরহামেশা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। নারীদেরকে বলা হচ্ছে মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলো। প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে– শরঈ হিজাবের সাথে নেকাবের কোনো সম্পর্ক নেই। আর চেহারা পর্দাবশ্যক অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত নয়।

আমার বোধগম্য নয় যে, চেহারা ঢেকে রাখাটা কি এমন ঘোরতর অপরাধ– যা থেকে তারা নারীদেরকে মুক্তি দিতে চায়। যে সমাজ ব্যবস্থায় চেহারা খোলা রাখার কালচার ব্যাপকতা পেয়েছে, তাদের অবস্থা কি? তারা তো আজ প্রতিনিয়ত কামনা-বাসনার অগ্নিতে পুড়ছে। বেহায়পনা ও নির্লজ্জতার চর্চায় সর্বদা লিপ্ত থাকছে।

শায়েখ আবু বকর আল জাযায়েরী (আলজেরিয়া)

শায়খ আবু বকর আল-জাযায়েরী তার রচিত "فصل الخطاب في المرأة والحجاب" নামক কিতাবে চেহারার পর্দার আবশ্যিকতার ব্যাপারে প্রমাণাদি পেশ করার পর বিরোধী পক্ষের আপত্তিসমূহের জবাবও দিয়েছেন।



আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন শানকিতী (মুরিতানিয়াহ)

আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন শানকিতী তার তাফসীর গ্রন্থ " أضواء البيان "- এ পর্দার আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদৃঢ় দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, নারীদের জন্য মুখমণ্ডলের পর্দা করা ওয়াজিব।

শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ কাফি (তিউনিস)

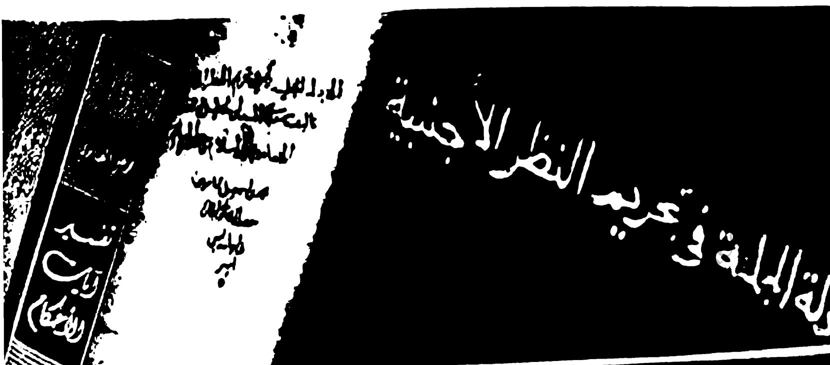
শায়খ মহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ কাফি তদীয় কিতাব–
" المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية "- তে চেহারা খোলার রাখার প্রবক্তাদের এক হাত নিয়েছেন। হুমুদ তাওযিরী তার রচিত " الصارم المشهور " নামক কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন।

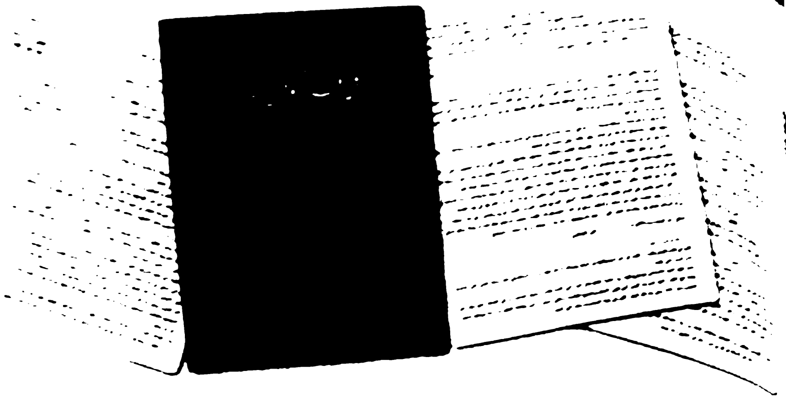
মাওলানা আব্দুল কাদের হাবীবুল্লাহ সিন্দী (সিন্দ, পাকিস্তান)

মাওলানা আব্দুল কাদের হাবীবুল্লাহ সিন্দী পর্দার ব্যাপারে দুটি কিতাব লিখেছেন।

১. " رسالة الحجاب في الكتاب والسنة "
২. " رفع الجُنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة "

উভয়টিতেই তিনি চেহারার পর্দার অবশ্যিকতার বিষয়টি সপ্রমাণ উল্লেখ করেছেন।





শায়খ মুস্তফা সবরী (তুরস্ক)

তুরস্কের প্রধান মুফতি শায়খ মুস্তফা সবরী তার কিতাব " قولي في المرأة " –তে নারীদের চেহারা অবমুক্ত রাখার পক্ষে মত দানকারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

শায়খ আব্দুর রশীদ বিন মুহাম্মাদ সখি (নাইজেরিয়া)

'চেহারা খোলা রাখার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা হেজাজের অধিবাসীদের নিজস্ব রীতি'– বলে একদল আলেম মত প্রকাশ করেছেন। শায়খ আব্দুর রশীদ বিন মুহাম্মাদ সখি তার লিখিত " السيف القاطع للنزاع في حكم الحجاب والنقاب "– নামক কিতাবে তাদের সে উক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং চেহারা ঢেকে রাখার আবশ্যিকতার পক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অধ্যাপিকা ই'তিসাম আহমদ সাররাফ (মিসর)

অধ্যাপিকা ই'তিসাম আহমদ সাররাফ একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম– " أختي المسلمة: سبيلك إلى الجنة " এই কিতাবের ২০ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

চেহারার পর্দা নারীদের এক সহজাত আমল। ইসলামী শরিয়ত এর প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছে।

অধ্যাপিকা ইয়াসরিয়া মুহাম্মাদ আনওয়ার (মিসর)

অধ্যাপিকা ইয়াসরিয়া তার কিতাব "مهلاً يا صاحبة القوارير"-এ লিখেছেন :

ইসলাম যেহেতু নারীদের চরণ ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছে এবং জমিনে সজোরে পা ফেলে চলতে নিষেধ করেছেন যেন পায়েলের ঝনঝনানি শোনা না যায়। তাহলে চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম তো আরো অগ্রগামী। কারণ, চেহারাই তো রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু।

শায়খ আহমদ বিন হাজার আলে আবূ তামী (কাতার)

শায়খ আহমদ বিন হাজার আলে আবূ তামীও আলোচ্য বিষয়ে "الأدلة من السنة والكتاب في حكم الخمار والنقاب" নামক একটি কিতাব লিখেছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ যমযমী বিন সিদ্দীক (মরক্কো)

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল তার কিতাব عودة الحجاب – এ মুহাম্মাদ যমযমীকে সেসকল আলেমদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন যাদের মতে নারীদের মুখমন্ডলের পর্দা ওয়াজিব।

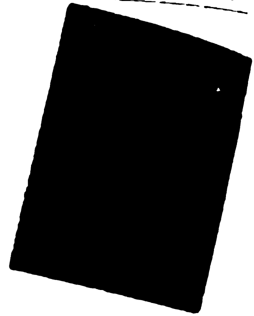
শায়খ আল-আযহার আব্দুল হালীম মাহমুদ (মিসর)

শায়খ আল-আযহার লেবাননের রাজধানী বায়রুত থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা 'সাওতুল আরব'–এ " مظهر المرأة " এর শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

নারীদের পক্ষ থেকে ফেতনার দুয়ার রুদ্ধ করতে হলে তাদের জন্য চেহারা ও হস্তদ্বয়ের পর্দা করা জরুরী।







শায়খ হাসানুল বান্না (মিসর)

ইখওয়ানুল মুসলেমীনের প্রধান শায়খ হাসানুল বান্না তার কিতাব "المرأة المسلمة" এর ১৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন– ইসলাম নারীদের বেপর্দা চলাফেরাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

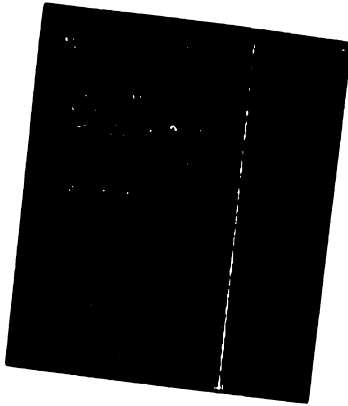
শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাসান হুজুমী (মরক্কো)

শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাসান হুজুমী স্বীয় কিতাব "الدفاع عن الصحيحين" এর ১২৯-১৩০ নং পৃষ্ঠায় জনৈক ডক্টরের বক্তব্যকে প্রত্যাখান করেছেন; যিনি নারীদের চেহারা খোলা রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ডক্টর মুহাম্মাদ সাঈদ রমযান বূতী (সিরিয়া)

ডক্টর বূতী তদীয় কিতাব "إلى كل فتاة تؤمن بالله"-এর ৫০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

এ ব্যাপারে সব মাযহাবের ইমামগণ ঐক্যমত্যে পৌছেছেন যে, যদি ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার ভয় হয় এবং পুরুষেরা কামুক দৃষ্টিতে নারীদের দিকে তাকায়, তাহলে নারীদের জন্য চেহারার পর্দা করা ফরয। বর্তমানে কে বলতে পারবে যে, নারীদের পক্ষ থেকে ফেতনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে না এবং পুরুষেরা নারীদের দিকে কু-বাসনা নিয়ে তাকাচ্ছে না।



শায়খ আয়াদাহ কুবাইসী (ইরাক)

শায়াখ আয়াদাহ কুবাইসী তার কিতাব "لباس التقوى"- তে নারীদের চেহারা ঢেকে রাখার আবশ্যিকতার বিষয়টি সমর্থন করেছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাউসারী (তুরস্ক)

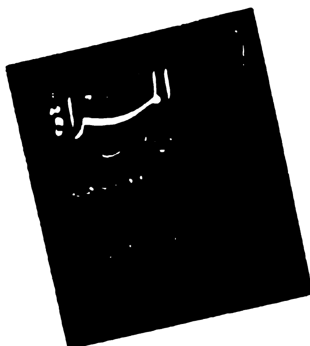
শায়খ মুহাম্মাদ যাহেদ যাহেদ আল-কাউসারী তার লিখিত " حجاب المرأة " শীর্ষক প্রবন্ধে মুখমণ্ডলের পর্দার সপক্ষে মত দিয়েছেন।

মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (ভারত)

যেসকল আলেম নারীদের চেহারা খোলা রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন তাদের জবাবে মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম–

"إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب"

এ কিতাবের ১০ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : পর্দার বিধান অবতীর্ণের মূল হেকমতের দাবি সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা। বিশেষ করে চেহারা। কেননা চেহারাই নারীর মুগ্ধ করা রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশের কেন্দ্রস্থল।



অধ্যাপিকা ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ যাহরা (ইয়ামেন)

অধ্যাপিকা ফাতেমা তার রচিত " المتبرجات " নামক কিতাবে পর্দার শর্তাবলি বর্ণনা করেছেন এবং নারীদের মুখমণ্ডলের পর্দার আবশ্যিকতার বিষয়টি বিস্তারিত প্রমাণাদিসহ তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপিকা কাউসার মিনাবী (মিসর)

অধ্যাপিকা কাউসার তার কিতাব " حقوق المرأة في الإسلام " এর ১২৮ নং পৃষ্ঠায় يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ আয়াতটি উল্লেখ করে লিখেছেন– এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিম নারীদেরকে বড় চাদরে নিজেদের চুল ও চেহারা ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন।

শায়খ আল-আযহার মুহাম্মাদ আবুল ফযল (মিসর)

শায়খ আল-আযহার মুহাম্মাদ আবুল ফযল একটি সুদীর্ঘ ফতোয়া দিয়েছিলেন যেটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি তাতে নারীদের চেহারার পর্দার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছেন।

মাওলানা আব্দুর রব করশী (পাকিস্তান)

মাওলানা আব্দুর রব করশী তার কিতাব " الأبحاث الفقهية القيمة " তে এ বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং নারীদের মুখমণ্ডলের পর্দার আবশ্যিকতাকে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন।

শুনলাম এবং মানলাম

আসলে উরাইযের জন্য এতো ফতোয়ার প্রয়োজন ছিল না। কোরআন ও হাদিসেই যখন চেহারার পর্দার আবশ্যিকতার বর্ণনা রয়েছে, তখন এতসব ফতোয়ার দরকার কি?

উরাইয বলল, আমি পূর্বে জেনেছিলাম 'মুখমণ্ডলের পর্দার প্রথা কেবল আরব তথা সৌদি অধিবাসীদের নিজস্ব রীতি'। কিন্তু গোটা পৃথিবীর নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার পর আমার সে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে।

সাহসী সিদ্ধান্ত

উরাইয ও মিহার মাঝে আলোচনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সারা বলল, প্রকৃত শক্তিশালী সেই, যে সঠিক সময়ে সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং নিজেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে। আজ আমাদের কতো বোন চেহারার পর্দার গুরুত্ব ঝোঝে অথবা অন্তত এতটুকু মানে যে, চেহারা ঢেকে রাখাটাই উত্তম। তাদের সেটা করার ইচ্ছাও জাগে। কতেক সময় কোনো পূর্ণ পর্দাবৃতা নারীকে দেখে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হায়! আমিও যদি তার মতো পরিপূর্ণ পর্দা করতে পারতাম। এভাবেই বছরের পর বছর চলে যায়; কিন্তু তারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে আসার সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।'
(সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালনে ঐচ্ছিকতার কোনো সুযোগ নেই। ইচ্ছা হোক বা না হোক আল্লাহর বিধান মানতেই হবে। আর আল্লাহ তাআলাও কোনো মানুষের ওপর তার সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দেন না। পর্দা আল্লাহ প্রদত্ত এক অলঙ্ঘনীয় বিধান। এটি চাশতের নামায ও দান-সদকার ন্যায় ইচ্ছা নির্ভর কোনো ইবাদত নয়। বরং এটি ইসলামের এক মহান ফরয বিধান। পরকালে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এটি ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এর মাঝেই মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়ের অন্তরের পবিত্রতা নিহিত। আল্লাহ তাআলা যেমনটি বলেছেন–

"ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"

'এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।' (সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৩)

পর্দা নারীর লজ্জার ভূষণ। এটি নারী লাজুকতা ও কোমলতায় পূর্ণতা আনে।

উরাইয ও মিহা! দেখো, পৃথিবীর সবকিছুই পর্দা করে।

সমীরণের চাদরে ঢাকা ভূপৃষ্ঠের ঘূর্ণন। তাজা ফল-ফলাদিতে আছে বাকলের আবরণ। খাপের আচ্ছাদনে থাকে তরবারী। কলমের বডিতে ঢাকা থাকে কালি। অমূল্য চোখের সুরক্ষায় আছে পাপড়ির ছাউনি।

নারী হলো সুবাসিত ফুল। সবাই চায় তার ঘ্রাণ নিতে। তাই তাদের পর্দাবৃত হয়ে থাকতে হবে। ফলের বাকল ফেলে দিলে তা নষ্ট হয়ে যায়। আবরণ মুক্ত কলা কালো হয়ে যায়।



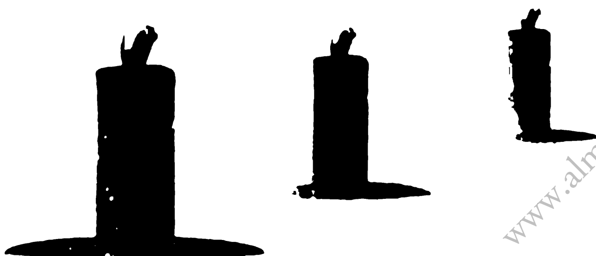
তোমরা এসব কিছুর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। তাই নিজেদেরকে পর্দাবৃত রাখো।

সারার কথাগুলো মিহার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলল। ইন্টারনেটে পড়া এক আমেরিকান তরুণীর ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। সে সারাকে বলল, হ্যাঁ, সত্যিই, পর্দায় থাকার মাঝেই রয়েছে নারীর প্রকৃত মর্যাদা। এই পর্দার বদৌলতে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সারা আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। মিহা বলতে লাগল– ঘটনাটি আমি ইন্টারনেটে পড়েছিলাম। এক পূর্ণ পর্দাশীলা নারীর হাতে সাতজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে ছিল এক আমেরিকান মুসলিম নারী। নিজ ধর্ম ইসলাম নিয়ে তার গর্বের শেষ ছিল না। তার কারণে তিনজন প্রফেসর এবং চারজন শিক্ষার্থী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

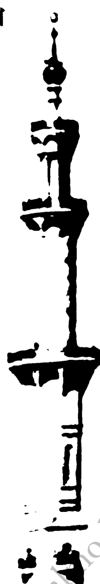
মেয়েটির কারণে ইসলাম গ্রহণকারী এক প্রফেসর সাংবিদকদের কাছে দেওয়া সাক্ষাতকারে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের ভার্সিটিতে এক আমেরিকান মুসলিম নারী পড়ত। সে আপাদমস্তক পর্দায় ঢেকে ভার্সিটিতে আসত। ভার্সিটির এক প্রফেসর ছিল ইসলাম ধর্মের ঘোর বিদ্বেষী। সে সবসময় অবলা সরলা মেয়েটিকে নানাভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করত। কিন্তু মেয়েটি ঈমানের বলে বলিয়ান ছিল। অবশেষে সে অধৈর্য হয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ জানাল।



ভাইস চ্যান্সেলর বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করলেন এবং দুজনকেই তাদের আপত্তিসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রমাণসহ পেশ করতে বললেন। ভার্সিটির প্রায় সব প্রফেসরই এই অভিনব বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

মেয়েটি প্রফেসরের ব্যাপারে বলল, ইনি ইসলাম ধর্মকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন। আর সেজন্যেই তিনি আমার সাথে অসঙ্গত আচরণ করেন। উপস্থিত অপর এক অমুসলিম ছাত্রী তার কথার সত্যায়ন করে প্রফেসরকে দোষী সাব্যস্ত করল।

প্রফেসর দেবার মতো উত্তর খুঁজে না পেয়ে ইসলামকে কটাক্ষ করে আবোল তাবোল বকতে শুরু করল। ছাত্রীটিও তখন প্রফেসরের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিল এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী সবার সামনে তুলে ধরল। ছাত্রীটির প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত সবার মনে দাগ কেটে গেল। তারা তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। মেয়েটিও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাদের সব প্রশ্নের সন্তোষমূলক জবাব দিতে থাকল। প্রফেসর যখন দেখল বিতর্ক অনুষ্ঠানটি ইসলামী লেকচারের রূপ পরিগ্রহ করেছে, তখন সে সেখান থেকে কেটে পড়ল।



প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে মেয়েটি উপস্থিত প্রফেসরবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান সম্বলিত কিছু বই বিতরণ করল। এই ঘটনাটি কিছু দিন পর্যন্ত টক অব দ্যা ভার্সিটি ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই ভার্সিটির চার শিক্ষার্থী এবং তিন প্রফেসর ইসলাম গ্রহণ করে নিল।

সারা এবং উরাইয আগ্রহের সাথে সেই আকর্ষণীয় ঘটনাটি শুনছিল। উরাইযের মনে একটি প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছিল।



নারীদের মাহরাম কারা

আচ্ছা সারা! তো আমি কার কার সামনে চেহারা খোলা রাখতে পারব? প্রশ্ন উরাইযের।

জবাবে সারা বলল, নারীরা তাদের মাহরামের সামনে চেহারা খোলা রাখতে পারে। এরা হলেন সেসকল লোক যাদের সাথে কোনভাবেই বিবাহ বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা সূরা নূর-এর মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেছেন–

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۠ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۠ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۠ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' *(সূরা নূর, আয়াত : ৩১)*

মাহরামরা হলেন–

* স্বামী * পিতা * শশুড়
* পুত্র (আপন ও দুধ সম্পর্কিত)
* স্বামীর সন্তান তথা বৈমাত্রেয় পুত্র
* ভাই (বংশীয় ও দুধ সম্পর্কিত)
* ভ্রাতুষ্পত্র * ভগ্নিপুত্র * স্ত্রীলোক * অধিকারভূক্ত দাস
* যৌন কামনামুক্ত পুরুষ * নাবালেগ বালক



মিহা এবং উরাইয নিশ্চিদ্র মনোযোগের সাথে সারার কথা শুনছিল। আল্লাহর বিধানের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে এলো। উরাইয তো নিজের উড়নার এক প্রান্ত দিয়ে চেহারা ঢেকে নিয়ে বলল, আজকের পর এই চেহারা মাহরাম ব্যতিত আর কেউ দেখবে না। সত্যিই! আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে কতো প্রশান্তি।

এরই মধ্যে মাগরিবের আযান শোনা গেল। চোখের পলকে কেটে গেল তিন তিনটি ঘণ্টা। প্রদর্শনীর সময়ও প্রায় শেষ। কিন্তু কিতাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তখনও পড়া হয়নি।

সারা বলল, উরাইয ও মিহা! তোমাদের তাড়া নেই তো? কিতাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখনও বাকী।

যার মধ্যে যেসকল ওলামায়ে কেরাম পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখাকে বৈধ বলেছেন, তাদের প্রদত্ত প্রমাণাদি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমি চাই তোমরা দুজন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাটুকুও শুনে যাও। যেন বিরোধী পক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারো। কি বলো? তোমরা শুনবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয় শুনব। কিন্তু তার আগে মাগরিবের নামাযটা পড়ে নেয়া দরকার। বলল উরাইয।

তারা তিনজন ধীরেসুস্থে মাগরিবের নামায আদায় করে আবার এসে বসল। সারা যথারীতি পড়া শুরু করল।



এবং তার



প্রথম দলিল

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস। যা ইমাম মুসলিম রহ. তার কিতাব সহিহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হলো-

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللّٰهُ عليْه وسلَّم توجَّه فِي آخرِ خُطْبَة الْعِيدِ للنِّساءِ .. ثُمَّ أَمَرَ النِّساءَ بالصَّدقَةِ .. قال جابرٌ : فقامت امْرأةٌ من سطة النِّساء سفْعاءُ الْخَدَّيْنِ فقَالَتْ : لِمَ يا رَسُول الله ؟ .. إلى آخرِ الْحديْث ...

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের খোতবা শেষে নারীদের দিকে মনোযোগি হলেন। তিনি তাদেরকে সদকা করার হুকুম দিলেন। তখন নারীদের মধ্য হতে মলিন চেহারার অধিকারীণী এক নারী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল! কেন? *(মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৮৮৫)*

হাদিসটিতে হযরত জাবের রাযি. প্রশ্নকারী নারীটির বর্ণনায় 'মলিন চেহারার অধিকারীণী' শব্দটি বলেছেন। বোঝা যায় সেই নারীর চেহারা তখন অনাবৃত ছিল।

জবাব

প্রথম কথা হলো এই ঘটনাটি হযরত জাবের রাযি. ছাড়াও আরো কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। যারা সবাই ঈদের নামাযে শরিক ছিলেন এবং মেয়েটিকে দেখেছেন। হযরত জাবের রাযি. ব্যতিত হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু সাঈদ খুদরী রাযি.-দের থেকে হাদিসটির বর্ণনা পাওয়া যায়।



কিন্তু হযরত জাবের রাযি. ছাড়া অন্য কেউ সেই নারীর চেহারার বর্ণনা দেননি। সম্ভবত হযরত জাবের রাযি. সেই নারীটিকে পূর্ব থেকেই চিনতেন এবং পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাকে দেখেছিলেন। এটাও হতে পারে যে, 'মলিন চেহারার অধিকারীণী'– তার উপাধী ছিল। আর হযরত জাবের ব্যতিত অপরাপর সাহাবীদের সেকথা জানা ছিল না।

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর বর্ণনায় 'এক মহিলা' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। যাকে সম্ভ্রান্ত নারীদের মধ্যে গণ্য করা হতো না। *(আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২/১৯০ ও মুসনাদে আহমদ, ১/৩৭৬)*

ইবনে ওমর রাযি. এর বর্ণনায় এসেছে– 'এক সুঠাম দেহসৌষ্ঠববিশিষ্টা নারী বলল'। *(মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৭৯)*

ইবনে ওমর রাযি. দূর থেকে দেখেই তাকে সুঠাম দেহসৌষ্ঠববিশিষ্টা বলে আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু তার চেহারার কোনো বর্ণনা দেননি।

ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণনায় কেবল- 'এক মহিলা বলল' এরূপ এসেছে। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-৯৭৯)*

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.ও 'এক মহিলা বলল'– বলে রেওয়ায়াত করেছেন। *(মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৮০)*

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় 'মহিলাগণ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)' *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-৩০৪)*

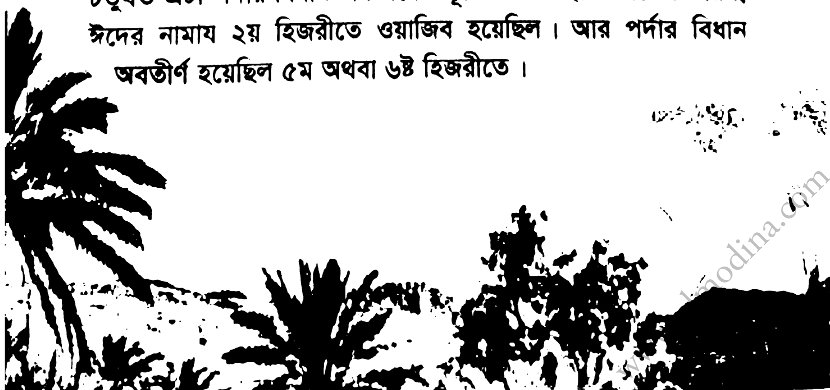


হযরত জাবের রাযি. ব্যতিত সেখানে আরো পাঁচজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। যাদের কারো বর্ণনায় মহিলাটির চেহারার কথা উল্লেখ নেই। সম্ভবত হযরত জাবের রাযি. তাকে আগে থেকেই জানতেন। হতে পারে মহিলাটি দাঁড়ানোর সময় তার চেহারা থেকে উড়না সরে গিয়েছিল আর ইত্যবসরে হযরত জাবের রাযি. তাকে দেখে ফেলেছিলেন। আর ফিকাহ শাস্ত্রের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো কোনো রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় সন্দেহ-সম্ভাবনার উপস্থিতি থাকলে, হয়তো এটা নয়তো ওটা– এরূপ সংশয় হলে সেই রেওয়ায়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করণ ও গ্রহণ কোনোটিই বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত যদি মেনেও নেয়া হয় যে, সেই নারীটির চেহারা খোলা ছিল, তাহলে এমনও হতে পারে যে, সেই নারীটি ছিল বয়োবৃদ্ধা। যার ওপর পর্দার আবশ্যিকতা ছিল না। আর এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, কোনো যুবতী নারী ভরা মজলিশে এতো পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্ভয়ে কথা বলতে পারে না। হয়তো সে নিজেকে বয়োজেষ্ঠ্য ভেবে দাঁড়িয়ে ছিল।

তৃতীয়ত সেই মহিলাটি কোনো সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিল না। তদুপরি তার 'মলিন চেহারার অধিকারীণী' হওয়াটা সে বাঁদী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতবাহী। কারণ, সে যুগের দাসী-বাঁদীদের চেহারা এরূপই হতো। আর ইসলামি শরিয়তে দাসী-বাঁদীদের জন্য চেহারার পর্দা ওয়াজিব নয়।

চতুর্থত এটা পর্দার বিধান অবতীর্ণের পূর্বের ঘটনা হতে পারে। কারণ, ঈদের নামায ২য় হিজরীতে ওয়াজিব হয়েছিল। আর পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল ৫ম অথবা ৬ষ্ট হিজরীতে।



দ্বিতীয় দলিল: খুসআমি মহিলার ঘটনা

নারীদের চেহারা খোলা রাখার পক্ষে যারা বলেন– তাদের দ্বিতীয় দলিল হলো বুখারী শরীফে উল্লেখিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস।

হাদিসটি হলো–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْفَضْلِ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, একদা ঈদুল আযহার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস রযি. কে স্বীয় সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস রাযি. সুন্দর-সুপুরুষ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতে থামলেন। ইত্যবসরে খাসআম গোত্রের এক সুশ্রী নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু জিজ্ঞেস করল। হযরত ফযল রাযি. তার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে তাকিয়ে দেখলেন ফযল সেই নারীটির দিকে তাকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চিবুক ধরে চেহারাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন'। *(বুখারী শরিফ, হাদিস নং-৬২২৮)*



জবাব

প্রথম কথা হলো আলোচ্য হাদিসে একথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি যে, মহিলাটির চেহারা অনাবৃত ছিল। মহিলাটিকে সুশ্রী বলা হয়েছে। আর কোনো মহিলার সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য তার চেহারা দেখা জরুরী নয়। হাত-পায়ের সৌন্দর্য দেখেও ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ও রূপ-লাবণ্যের সজীবতা অনুমান করা যায়। যদি বাস্তবিকই মহিলাটির চেহারা খোলা থাকত তাহলে বর্ণনাকারী তাকে وَضِيئَةٌ (সুশ্রী) শব্দ না বলে جَمِيْلَةٌ (সুন্দরী) বলত।

দ্বিতীয়ত হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ফযল রাযি. তাকে দেখার পর তার (حُسْنٌ) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। এখানে বলা হয়নি যে, তার (جَمَال) রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হলেন। আরবী ভাষায় حُسْنٌ এবং جَمَالٌ শব্দদুটির মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে। جَمَالٌ শব্দটিকে চেহারার রূপ-মাধুরী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসলে মহিলাটির মার্জিত চাল-চলন হযরত ফযল রাযি. কে প্রভাবিত করেছিল। তাই বর্ণনাকারী এখানে حُسْنٌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। চেহারার কমনীয়তার বর্ণনা করতে চাইলে তিনি অবশ্যই جَمَالٌ শব্দটি ব্যবহার করতেন।

তৃতীয়ত ধরে নিলাম যে, মহিলাটির চেহারা তখন অনাবৃত ছিল। তাহলে হজ ইত্যাদিতে নারীদের জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফযল রাযি.এর মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতেন না। কারণ, তিনি তো কোনো হারাম কাজে লিপ্ত ছিলেন না।

চতুর্থত হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাযি. থেকে বর্ণনা রয়েছে, হযরত আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার চাচাত ভাইয়ের ঘাড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি একজন যুবক পুরুষ ও যুবতী নারীকে দেখলাম এবং তাদের দুজনের ব্যাপারে শয়তানের (প্রতারণার) আশঙ্কা করছিলাম। (মুসনাদে আহমদ, ১/৭৫)

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফযল রাযি. এর ঘাড় শুধু এই ভেবেই ঘুরিয়ে দেননি যে, তিনি যেন এক সুন্দরী নারীর অপরূপ দেহের দিকে তাকান এবং তার সুমিষ্ট কণ্ঠের মনোহরী বচন শুনতে না পান। বরং নেপথ্য কারণ এটাও ছিল যে, হযরত ফযল রাযি.ও একজন সুদর্শন যুবক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশঙ্কা হচ্ছিল যে, তাকে দেখে সেই মহিলাটিও ফেতনায় পড়ে যাবে। তিনি উভয়ের দিকে উভয়ের দৃষ্টিপাত না হওয়াটা কামনা করছিলেন। আর এভাবেই তিনি দুজনের জন্যেই ফেতনার দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন।

আলোচ্য হাদিসটির কোথাও ওই মহিলাটির চেহারা খোলা থাকার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। বরং হাদিসটি চেহারার পর্দার আবশ্যিকতার ব্যাপারে আরেকটি মজবুত দলিল।

তৃতীয় দলিল

ইমাম আবু দাউদ রহ. তার কিতাবে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন–

عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه...

হযরত খালিদ বিন দুরাইক উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা আসমা বিনতে আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এখানে আসলেন। তার গায়ের কাপড়টি পাতলা ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন, আসমা! প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মেয়েদের চেহারা ও হস্তদ্বয় ব্যতিত শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ দৃশ্যমান হওয়া উচিত নয়। **(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৪১০৪)**

জবাব

এই হাদিসটি যঈফ (দূর্বল)। এটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে না।

কারণ :

* হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইমাম আবু দাউদ রহ. নিজেই লিখেছেন যে, এটি খালেদ ইবনে দুরাইকের পক্ষ থেকে একটি মুরসাল রেওয়ায়াত। খালেদ ইবনে দুরাইক হযরত আয়েশা রাযি. এর যুগের ছিলেন না।

* এই হাদিসের সনদে সাঈদ বিন বশীর আবু আব্দুর রহমান বসরী নামের এক রাবী আছেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম যাকে যঈফ বলেছেন। যার বর্ণিত হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হতো না।

* হাদিসের সনদে কাতাদাহ এবং ওলিদ বিন মুসলিম নামী আরো দুজন রাবী আছেন, যারা হাদিস বর্ণনায় 'তাদলিস' করে থাকেন। তাই তাদের থেকে বর্ণিত হাদিস প্রমাণ হিসেবে পেশযোগ্য নয়।

উপরিউক্ত তিনটি দোষের কারণে হাদিসটি যঈফের স্তরে পড়ে। সুতরাং এটিকে দলিল হিসেবে উপাস্থাপন করা ঠিক নয়।

এতটুকু পড়ার পর সারা কিতাব থেকে মাথা তুলল। মিহার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, আমার কাছে এ ব্যাপারে চতুর্থ আরেকটি জবাব আছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই হাদিসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বোন্ধ করা ঠিক নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা রাযি. এর সাথে বসে আছেন। আর ওনার শালিকা আসমা– যিনি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন, পাতলা কাপড়ের পোষাক পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে যাবেন! বিষয়টি কিছুতেই বোধগম্য হবার নয়।

কেননা, অজ্ঞতার যুগের আরব নারীরাও যথাযথ পর্দা করত। সে যুগের এক নারীর ঘটনা। একবার রাস্তা দিয়ে চলার সময় হঠাৎ বেখেয়ালে তার মাথা থেকে উড়না খসে পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ এক হাতে উড়না ধরল আর অন্য হাতে দ্রুত চেহারা ঢেকে নিলো। এ দৃশ্য দেখে এক কবি একটি কবিতা আবৃত্তি করল-

سَقَطَ النَّصِيْفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ *

فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ

উড়নাটি তার পড়ে গেছে খসে, স্বেচ্ছায় নয় ভুলে
এক হাতে সে মুখটি ঢেকেছে অন্য হাতে উড়না তুলে

(দিওয়ানুন নুবাগা জিবয়ানী ১ : ২৪)

একবার ভাবো, প্রাক-ইসলাম যুগের নারীরাই যদি পর্দার ব্যাপারে এতটা সচেতন থাকে, তাহলে ইসলাম-যুগের নারীরা কেমন হবে?

বেশ, এবার বেপর্দার সূচনা কিভাবে হলো, সেই ঘটনাটি বলো।

সারা ঘড়ির দিকে তাকাল। হায় আল্লাহ! আমার আব্বা আমাকে নিতে আসার সময় হয়ে গেছে।

না, সারা! ওই ঘটনা না শুনে আমরা তোমাকে ছাড়ছি না। মিহা ও উরাইয জিদ ধরল।

আচ্ছা, শোনো তাহলে।



পর্দাহীনতা : যেভাবে শুরু

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে হিজরী চৌদ্দ শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলিম নারীরা পূর্ণ পর্দা করত। চেহারাও ঢেকে রাখত। শারীরিক কোনো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে পথে-ঘাটে বেরুতো না। হিজরী চৌদ্দ শতাব্দির শেষভাগে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তথা খেলাফতের ধারা সমাপ্তির পরপরই মুসলিম সমাজে ইসলামী রীতি-নীতিতে বিকৃতি সাধণে পশ্চিমা উপনিবেশই প্রথমত প্রধান ভূমিকা রাখে।

এক্ষেত্রে মিসরের নারীরাই সর্বাগ্রে চেহারা থেকে পর্দা খুলে ফেলে। মিসরের বাদশাহ মুহাম্মাদ আলী পাশা উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে ফ্রান্সে পাঠাতে থাকে। সেসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক শিক্ষার্থীর নাম ছিল রেফায়া তাহতাবী। সে শিক্ষাগ্রহণ শেষে মিসরে ফিরে আসার পর নারীদের চেহারা থেকে পর্দা খুলে ফেলার জন্য আন্দোলন শুরু করল। রেফায়া তাহতাবীর পর মারকাস ফাহমী নামী এক খৃষ্টান লেখক এই আন্দোলন অব্যহত রাখল। সে اَلْمَرْأَةُ فِي الشَّرْقِ - নামক একটি বই লিখল। যে বইটিতে সে নারীদেরকে পর্দা থেকে বেরিয়ে আসা ও পুরুষ-নারীর অবাধ বিচরণের প্রতি ব্যাপক উৎসাহ যোগাল। মিসরের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আহমদ লুতফী সাইয়্যেদই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে মিসরীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সহশিক্ষার আবির্ভাব ঘটায়। আহমদ লুতফী সাইয়্যেদের পর ত্বহা হুসাইন এবং কাসেম আমিন নামক ব্যক্তিদ্বয় এই আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করে। কাসেম আমিন তো এ ব্যাপারে تَحْرِيْرُ الْمَرْأَةِ (নারীর মুক্তি) এবং اَلْمَرْأَةُ الْجَدِيْدَةُ (আধুনিক নারী) নামক দুটি বইও লিখে ফেলে। কাসেম আমিনের বই দুটি পড়ে সা'দ যাগলুল এবং আহদম যাগলুল অত্যন্ত প্রভাবিত হলো। তারা দুজনও পর্দাহীনতার এ আন্দোলনকে সফল করতে ওঠে পড়ে লাগল।



পরে কায়রোতে হুদা শা'রাবীর নেতৃত্বে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। যে আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিম নারীদের চেহারা থেকে পর্দা হটানো। নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সমাবেশ ১৯২০ সালে মিসরের মুরকাসায় অনুষ্ঠিত হয়।

হুদা শা'রাবীই ছিল মিসরের সর্বপ্রথম নারী: যে কিনা পর্দাশীলা মুসলিম নারীদের শরীর থেকে পর্দা ছিনিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। অবশেষে সাদ যাগলুল বৃটেন থেকে ফিরে আসার দিন ঘনিয়ে এলো। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমান বন্দরে দুটি বড় তাবু স্থাপন করা হলো। একটিতে ছিল পুরুষ অপরটিতে নারী। সাদ যাগলুল বিমান থেকে নেমে সোজা নারীদের তাবুর দিকে চলল। যে তাবু পর্দাবৃতা বহু নারীর উপস্থিতিতে ভরপুর ছিল। সে তাবুতে প্রবেশ করা মাত্রই হুদা শা'রাবী তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নিল। হুদা নিজেও তখন আপাদমস্তক পর্দাবৃতা ছিল।

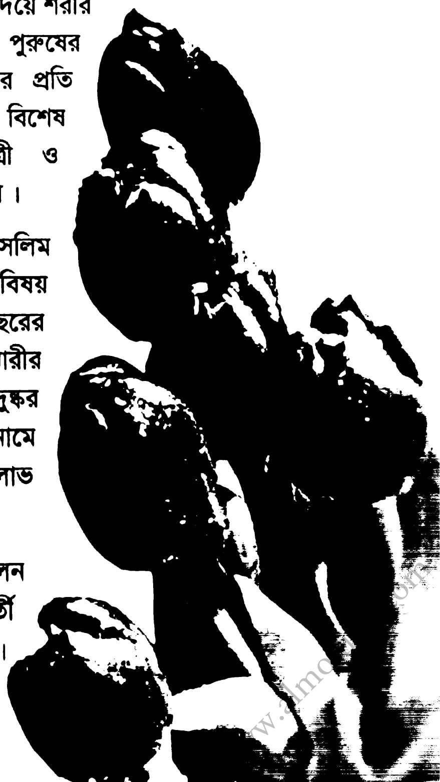


সাদ যাগলুল এক ঝটকায় হুদার চেহারা থেকে পর্দা খুলে ফেলল। পুরো তাবু তখন করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠল। সাথেসাথে তাবুতে উপস্থিত বাকী সব নারীরাও তাদের চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলল। আর এভাবেই পর্দাহীনতার আনুষ্ঠানিক সূচনার পূর্ব পরিকল্পিত নাটক মঞ্চায়িত হলো।

পরে কায়রোতে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেকটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যে সমাবেশে সাদ যাগলুলের স্ত্রী সফিয়া ফাহমীও উপস্থিত ছিল। সে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজারো মানুষের সামনে নিজের পরিধেয় বোরকাটি খুলে পায়ের নিচে মাড়িয়ে ফেলল। সমাবেশে উপস্থিত বাকী নারীরাও তার অনুসরণ করল। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা সেই বোরকাগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হলো।

১৯৯০ সালে اَلسَّفُوْرُ (পর্দাহীনতা) নামী একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হলো। যেটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুতে ছিল নামের যথার্থতার বিচ্ছুরণ। ম্যাগাজিনের প্রতিটি পাতা ছিল নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে সোচ্চার।
আর সে অধিকার আদায়ে ম্যাগাজিনের লেখক সম্প্রদায় মুসলিম নারীর পর্দাকে অনাবশ্যক আবরণ আখ্যা দিয়ে শরীর থেকে তা ছুড়ে ফেলে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার প্রতি উৎসাহ যোগাচ্ছিল। ম্যাগাজিনটির বিশেষ কিছু পাতা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও মুক্তমনা নারীদের জন্য বরাদ্দ ছিল।



ধীরে ধীরে পথে ঘাটে পর্দাহীন মুসলিম নারীর নির্লজ্জ চলাফেরা মামুলি বিষয় হয়ে গেল। যে মিসরের হাজার বছরের ইতিহাসে পথে-প্রান্তরে মুসলিম নারীর বেপর্দা চলাফেরার নজির মেলা দুষ্কর ছিল, সেখানে নারী-স্বাধীনতার নামে পর্দাহীনতার কু-প্রথা ব্যাপকতা লাভ করল।

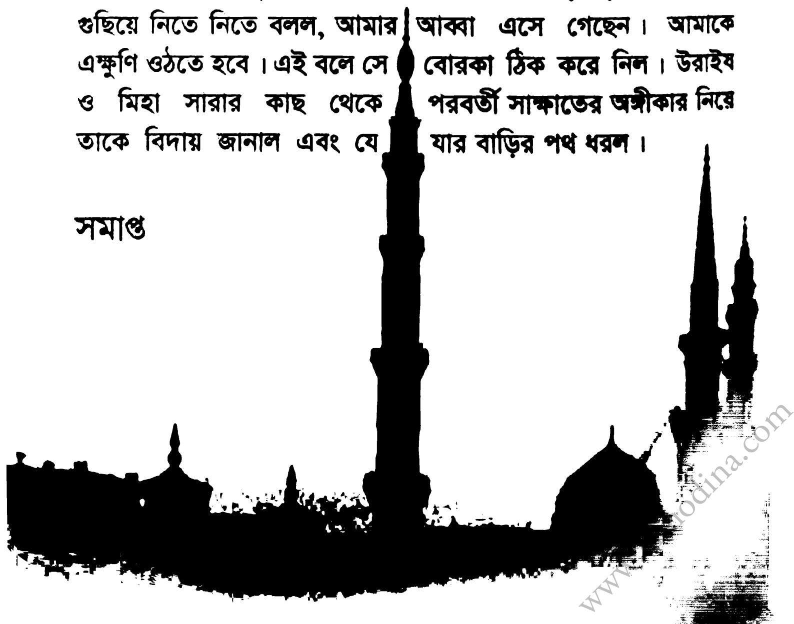
এরপর নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন নামের সংগঠনটি তাদের পরবর্তী এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর হলো।

তারা নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে পুরুষের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিলো। এখন নারী এয়ার হোস্টেস হয়েছে। বিমানে যাত্রীদের সেবিকার কাজ করছে। মদের দোকানে কাস্টমারের গ্লাস ভরে দিচ্ছে। হোটেল রিসিপশনে রূপের পসরা সাজিয়ে গ্রাহকের কামনার খোরাক যোগাচ্ছে। আর এভাবেই মুসলিম নারী তার স্বকীয়তা হারিয়ে পুরুষের মনোরঞ্জনের পণ্যে পরিণত হয়েছে।

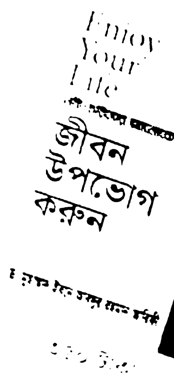
অবশেষে কালের আবর্তে মুসলিম দেশগুলোতেও ব্যাভিচার ও বেহায়াপনা ঘাটি গেড়ে বসল। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সন্তুষ্টির শর্তে ব্যাভিচারের শাস্তি তুলে নেওয়া হলো। তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, সোমালিয়া, আলজেরিয়া সহ আরো বহু মুসলিম দেশে যথারীতি আইন পাশ করে পর্দা পালনে কঠোরতা আরোপ করা হলো এবং পর্দানশীনা নারীদেরকে শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করানোর ঘোষণা দেওয়া হলো।

এতটুকু পড়ার পর হঠাৎ সারার মোবাইল বেজে ওঠল। স্ক্রীনে ভেসে ওঠা নাম্বার দেখে বুঝল আব্বা ফোন করেছেন। তড়িঘড়ি করে সবকিছু গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, আমার আব্বা এসে গেছেন। আমাকে এক্ষুণি ওঠতে হবে। এই বলে সে বোরকা ঠিক করে নিল। উরাইষ ও মিহা সারার কাছ থেকে পরবর্তী সাক্ষাতের অঙ্গীকার নিয়ে তাকে বিদায় জানাল এবং যে যার বাড়ির পথ ধরল।

সমাপ্ত



আমাদের প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহের কয়েকটি



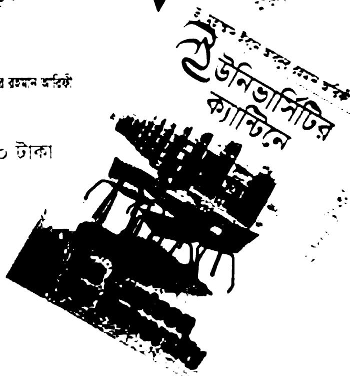




ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

মূল্য : ৫০০ টাকা











লেখক পরিচিতি

বর্তমান আরব জাহানের বিশিষ্ট দাঈ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী। খুব কম বয়সেই তিনি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে আরব-অনারব সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায়ও তিনি এখন এক নামে পরিচিত।

ডক্টর আরিফীর জন্ম ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই। বংশ পরিচয়ে তিনি ইসলামের বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র উত্তরসূরী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন দাম্মামে। এরপর সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন এবং রিয়াদের বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় ছিল– The Views of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah on Sufism – a Compilation and Study.

মুহাম্মাদ আরিফীর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ, শায়খ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক প্রমুখ। তিনি ইলমে ফেকাহ ও ইলমে তাফসীর শিক্ষা করেন শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহ.-এর কাছে। ইবনে বায রহ.-এর সোহবতে তিনি প্রায় পনেরো/ষোলো বছর থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ডক্টর আরিফী জীবনের মূল কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে। এই লক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে থাকেন। এরপরও তিনি রাজধানী রিয়াদের বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং আল-বাওয়ারদী জামে মসজিদের খতীব। শুক্রবার জুমার সময় তাঁর মসজিদে তিল ধারণের ঠাঁয় থাকে না।

ডক্টর আরিফী দাওয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য। একইভাবে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইসলামী অর্গানাইজেশনেরও মেম্বার। এসূত্রে রাবেতা আলমে ইসলামী ও বিশ্ব মুসলিম উলামা ঐক্য পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

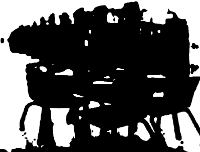
সুসাহিত্যিক ডক্টর আরিফী একজন সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতার কয়েক ডজন অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হচ্ছে।

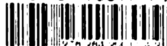
মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞ আলেম প্রায় বিশ/পঁচিশটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি বিক্রির ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তবে বক্ষমাণ পুস্তকটি তাঁর অন্যান্য বইয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। দুনিয়ার অনেক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে এই বইটি।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে





978-984-90011-4-9



বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে

বইটির লেখক আরব বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, সুবক্তা, সুসাহিত্যিক, বিজ্ঞ আলেম ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী।

তার সরস-সরল, প্রাঞ্জল, ব্যতিক্রমী লেখনী আরব বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃত। হুদহুদ প্রকাশন এই জীবন্ত কিংবদন্তীর সবকটি রচনা মূল আরবী থেকে প্রমিত বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। 'বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত' উন্মোচনের প্রত্যয় নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হুদহুদ প্রকাশন তার গন্তব্য পানে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে গতানুগতিক ধারার সীমানা ডিঙ্গিয়ে হুদহুদ কর্তৃক প্রকাশিত সবকটি বই পাঠককুলের অব্যক্ত ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে। নতুন বিষয়, ভিন্ন আঙ্গিক, পর্যাপ্ত উপকরণের একটি ভারসাম্য মিশেল হুদহুদের প্রতিটি বই জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। বক্ষমাণ বইটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

صَرْخَةٌ فِيْ مَطْعَمِ الْجَامِعَةِ নামে লিখিত এর মূল আরবী বইটি লক্ষাধিক কপি বিক্রির রেকর্ড গড়েছে। বইটিতে উপভোগ্য ভঙ্গিতে পর্দার আদ্যোপান্ত ও মা-বোনদের মুখাবয়ব ঢেকে রাখার আবশ্যিকতার বিষয়টি শরিয়তের অকাট্য প্রমাণাদি ও শিক্ষণীয় ঘটনার বর্ণনাসহ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনাও উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দের চাতুর্যসিক বাহুল্য নয় হৃদয়গ্রাহী ও গতিময় গদ্যে উপস্থাপিত হয়েছে রচনার প্রতিটি ছত্র। হুদহুদ প্রকাশনের পক্ষ থেকে হালের তরুণ-তরুণীদের জন্য এটি এক অমূল্য উপহার।

